সে দিবসের কাহিনী
ও
ঐতিহ্য

কেদারনাথ ভট্টাচার্য

নিশান প্রকাশনী
৪৬, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯।

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ, ১৯৬৩

প্রকাশক :
সুবিমল দাস
নিশান প্রকাশনী
৪৬, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

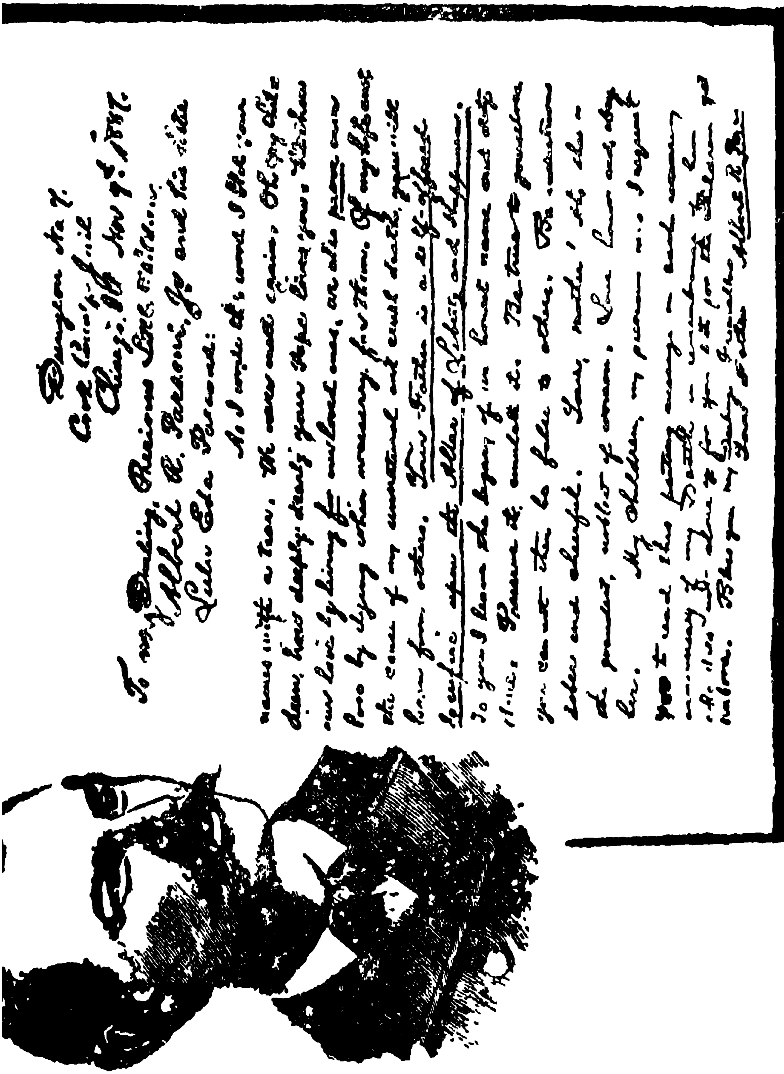
মুদ্রক :
নিউ রামকৃষ্ণ প্রেস
৬৩এ/২ হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
বুলবুল চৌধুরী

লাল পতাকা
যাঁদের রক্তে
আরো লাল হয়েছে,
তাঁদের
স্মৃতিতে।

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী



Dungeon No. 7.
Cook County Jail
Chicago, Ills, Nov 9th 1887.

To my Darling, Precious Little ones,
Albert R. Parsons, Jr. and his sister
Lulu Eda Parsons:

As I write this word I blot it out with a tear. We will never meet again. Oh my children, how deeply, dearly your papa loves you. We show our love by living for our loved ones, we also prove our love by dying, when necessary, for them. Of my life and the cause of my unnatural and cruel death you will learn from others. Your Father is a self-offered sacrifice upon the Altar of Liberty and happiness. To you I leave the legacy of an honest name and duty done. Preserve it and emulate it. Be true to yourselves, you cannot then be false to others. Be industrious, sober and cheerful. Your mother, she is the grandest, noblest of women. Love, honor and obey her. My children, my precious ones, I request you to read this parting message on each recurring anniversary of my death in remembrance of him who dies not alone for you but for the children yet unborn. Bless you, my darlings. Farewell. Your Father Albert R. Parsons

আলবার্ট আর. পার্সনস : ফাঁসির আগে তাঁর ছেলে-মেয়ের কাছে শেষ চিঠিখানির প্রতিলিপি।

মরণজয়ী ঐতিহ্য

"আজ তোমরা আমাদের টুঁটি টিপে ধরছ, কিন্তু আমাদের নীরবতা সেই কণ্ঠস্বরের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এমন দিন আসবে"—অগাস্ট স্পাইজের নির্ভীক উক্তি।

"এটা আমার জীবনে সবচেয়ে খুশির মুহূর্ত"—ফিশারের দৃপ্ত ঘোষণা।

"নৈরাজ্যের* জয় হোক"—এঞ্জেলের বাঁধন-হারা উল্লাস।

"হে আমেরিকার মানুষ, আমাকে বলার অনুমতি দেওয়া হবে কি? শেরিফ ম্যাটসন, আমাকে বলতে দিন! জনগণের কণ্ঠস্বর শোনা হোক!"—পার্সন্সের শেষ আকুতি।

১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে শ্রমিক শ্রেণীর চারজন বীর সন্তান যেটুকু বলতে পেরেছিল, সারা দুনিয়ারশ্রমিকের কাছে তা আজো জীবন্ত, শাশ্বত হয়ে আছে।

১৮৮৬ সালের মে দিবসের বিক্ষোভ মিছিলের নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে যখন আমেরিকায় বিচারের প্রহসন চলছিল, তখন শুধু আমেরিকার শ্রমিকেরাই নয়, সারা দুনিয়াতেই এবং বিশেষ করে ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, হলাণ্ড, রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত শ্রমিকেরা সেই বীর নেতাদের প্রাণরক্ষার জন্য সভা-সমাবেশ ক'রে একদিকে মামলা চালানোর টাকা তুলতে ব্যস্ত আর অন্যদিকে আমেরিকার সরকারের কাছে পাঠাচ্ছিল অজস্র তার-বার্তা। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। এমন কি ফ্রান্সের চেম্বার অব ডেপুটিজ আর ইংল্যাণ্ডের জর্জ বার্নার্ড শ, উইলিয়াম মরিস ইত্যাদি তখন তাঁদের প্রাণ-রক্ষায় ক্লান্তিহীন উদ্যমে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে চলেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মালিকগোষ্ঠী ও তাদের সরকার শ্রমিকদের সমুচিত শিক্ষা দেবার নির্মম বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য তাঁদের

---

*এঞ্জেল ছিলেন একজন নৈরাজ্যবাদী।

ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ইতিহাসের এমন এক জঘন্য কলঙ্কিত অধ্যায় সৃষ্টি করেছে, যা আজো দুনিয়ার খেটে-খাওয়া মানুষের মনে অবিনশ্বর হয়ে আছে।

কী ছিল তাঁদের দোষ? ঘটনার সূত্রপাতই বা হ'ল কী ভাবে?

১৮৬৬ সালের ২০শে অগাস্ট ৬০টি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা বাল্টিমোরে জমায়েত হয়ে গঠন করেন ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন। এই প্রতিষ্ঠা-সভাতেই প্রস্তাব নেওয়া হয়:

> "এই দেশের শ্রমিককে পুঁজিবাদী দাসত্বের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য, বর্তমানের প্রথম ও বিরাট প্রয়োজন এমন একটা আইন পাশ করা, যার ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাজ্যগুলিতে আট ঘণ্টাই যেন স্বাভাবিক কাজের দিন বলে গণ্য হতে পারে। যতদিন এই গৌরবময় ফল অর্জন করতে না পারি, ততদিন আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগের সংকল্প নিচ্ছি।"

শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মসূচী নেওয়ার সিদ্ধান্তও হয় ঐ সভায়।

দিকে দিকে শুরু হ'ল শ্রমিকদের ব্যাপক আন্দোলন। মালিকেরাও প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। ১৮৭৫ সালেই ফাঁসি দেওয়া হ'ল দশজন জঙ্গী খনি শ্রমিককে। আন্দোলন হয়ে উঠল আরো উত্তাল। শ্রমিক শ্রেণীর এক ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়ে দেখা দিল ১৮৭৭ সালের রেল ও ইস্পাত শ্রমিক ধর্মঘট।

তারপর ১৮৮৪ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে ফেডারেশন অব অর্গানাইজড ট্রেডস এণ্ড লেবার ইউনিয়নস অব দি ইউনাইটেড স্টেটস এণ্ড কানাডা (১৮৮৬ সালে যার নাম হয় আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার) প্রস্তাব নেয় যে, ১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে সারা দেশে দৈনিক আট ঘণ্টার কাজ চালু করার জন্য সমস্ত সংগঠিত শ্রমিক লড়াই করবে।

যুগটাও মনে রাখা প্রয়োজন। তখন দৈনিক ১২ ঘণ্টা থেকে ১৪ ঘণ্টা শ্রমিকদের খাটিয়ে বলগাহীন শোষণের মাধ্যমে আমেরিকায় একচেটিয়া পুঁজির জন্ম হচ্ছে; হেনরি ফোর্ড, রকফেলার ইত্যাদি রাঘব বোয়ালেরা দুনিয়াকে শোষণ করার ফাঁদ পাতছে। এমন অপকর্ম নেই যা এইসব মুনাফাশিকারী অর্থ-পিশাচদের অনায়ত্ত ছিল। ধর্মঘট ভাঙা ও মানুষ খুন করার জন্য গুণ্ডাবাহিনী তৈরি ক'রে এমন কি একটা কোম্পানিও খোলা হয়েছিল 'পিংকার্টন এজেন্সি' নামে। যেখানেই ধর্মঘট, সেখানেই শ্রমিকদের খুন ও রক্তস্রোতের জন্য ডাক পড়ত তাদের। ১৮৮৬ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম রেলপথের বিখ্যাত রেলশ্রমিক ধর্মঘটের ঠিক আগে রেলপথের ডাকসাইটে মালিক জে গোল্ড অত্যন্ত দম্ভের সাথে প্রকাশ্যেই বলেছিল —"শ্রমিক শ্রেণীর অর্ধেক অংশকে আমি ভাড়া করতে পারি, বাকি অর্ধেককে খুন করার জন্য।" মালিকদের এই সীমাহীন ঔদ্ধত্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তখনকার শ্রমিক শ্রেণীকে।

এদিকে সারা দেশ জুড়ে চলেছে মে দিবসের ব্যাপক প্রস্তুতি। ডাক এসেছে সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিককে সংগঠিত করার। এক বছরের মধ্যেই সংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা দু'লাখ থেকে সাত লাখে উঠে গেল, আন্দোলনে জোয়ার এল।

অবশেষে এল ১লা মে, ১৮৮৬ সাল। শুরু হ'ল আমেরিকা জুড়ে ধর্মঘটের উত্তাল তরঙ্গ, যদিও শিকাগোই ছিল ধর্মঘটের মূল কেন্দ্র। পাঁচ লাখেরও বেশি শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে ধর্মঘটে অংশ নেয়। আতঙ্কিত মালিকগোষ্ঠী উপলব্ধি করল ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর প্রতাপ। অবিলম্বে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার না করলে মালিক শ্রেণীর আর রেহাই নেই। ৩রা মে .তারিখে তাই ম্যাক্‌কর্মিক হার্ভেস্টার কারখানায় ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর নেমে এল নির্মম পুলিসী আক্রমণ। ফলে, ছয়জন শ্রমিক হ'ল নিহত আর আহত হল অজস্র। তারই প্রতিবাদে ৪ঠা মে তারিখে হে মার্কেট স্কোয়ারে ডাকা হ'ল শ্রমিকদের এক

বিক্ষোভ-সমাবেশ। আবার শুরু হ'ল পুলিসী বর্বরতা। ভিড়ের মধ্যে সহসা একটা বোমা ফাটে, আর তাতে মারা যায় একজন সার্জেণ্ট। সন্দেহ রইল না, এটা পুলিসেরই কুকীর্তি। তখন একটা খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় পুলিশ ও জনতার মধ্যে। সেখানে নিহত হয় সাতজন পুলিস ও চারজন শ্রমিক। শিকাগোর সেই রক্তস্নানের পরেই শুরু হয় সমস্ত জঙ্গী নেতাদের ব্যাপক গ্রেপ্তার আর পরবর্তী কালে ফাঁসি হল চারজন নেতার—অগাস্ট স্পাইজ, পার্সনস, ফিশার ও এঙ্গেল।

দেশে দেশে আজ যে দৈনিক আট ঘণ্টার কাজ চালু হয়েছে, এ ঘটনা তারই অনন্য পটভূমি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রেই সারা দুনিয়ার খেটে-খাওয়া মানুষের মে দিবস অনুষ্ঠান।

১৮৮৮ সালের ডিসেম্বরে সেণ্ট লুইতে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৮৯০ সালের ১লা মে থেকে এই দিবসটি প্রতি বছর পালিত হবে সারা আমেরিকায়। এই সিদ্ধান্তের কয়েক মাস পরেই ১৮৮৯ সালের ১৪ই জুলাই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্যারিস কংগ্রেসে এঙ্গেলসের উপস্থিতিতে (মার্কস তখন আর বেঁচে নেই) এই দিবসটিকে শুধু আমেরিকার নয়, সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের বিক্ষোভ ও সমাবেশের আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হবার সিদ্ধান্ত হয়। তাই ১৮৯০ সালের ১লা মে থেকে সারা পৃথিবীতেই এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

মে দিবস আজো কেন সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের কাছে এত প্রিয়, এত জীবন্ত? কী তার তাৎপর্য?

প্রথমত, মে দিবসই প্রথম এবং এখনো পর্যন্ত একমাত্র আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। দ্বিতীয়ত, সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিককে সংগঠিত করার আহ্বানই মে দিবসের ডাক। তৃতীয়ত, মালিক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে মে

দিবস। চতুর্থত, অর্থনৈতিক সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরের ডাক দিয়েছে মে দিবস।

যে "পুঁজিবাদী দাসত্বের" শৃংখল থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্ত করার শপথ নিয়ে মে দিবসের যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ মানবজাতির এক তৃতীয়াংশ সেই শৃংখল থেকে মুক্ত হয়ে বাস করছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। বাকী দুই তৃতীয়াংশ এখনো রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায়। বিশ্বজয়ী শ্রমিক শ্রেণীর জয়যাত্রা বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের কবর রচনার মধ্য দিয়ে এক নতুন বিশ্বমানবতার সৃষ্টি করে চলেছে—সে এক নতুন বিশ্ব, নতুন মানুষ। যে কণ্ঠস্বরকে মে দিবসে মালিকগোষ্ঠী ও তাদের রাষ্ট্র টুঁটি টিপে ধরেছিল, তা আজ সারা দুনিয়ায় কোটি কোটি উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে:

"দুনিয়ার শ্রমজীবী এক হও।"

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত

আমেরিকায় পুঁজিবাদ গড়ার যুগে যে বর্বর নৃশংস শোষণের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল, তার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল ঐতিহাসিক মে দিবসের পটভূমি। প্রথম দিকে কাজের ঘণ্টার কোনো বালাই ছিল না বললেই চলে—চোদ্দ, ষোল, আঠেরো, এমন কি কুড়ি ঘণ্টাও কাজ করতে হত খেটে-খাওয়া মানুষকে জীবিকার তাগিদে। ১৮০৬ সালে ফিলাডেল-ফিয়ার ধর্মঘটী জুতা শ্রমিকদেব নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা চলার সময় প্রকাশ পায় যে, শ্রমিকদের উনিশ থেকে কুড়ি ঘণ্টা পর্যন্ত দৈনিক খাটানো হত। ১৮৩৪ সালে নিউ ইয়র্কে রুটি তৈরির কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট চলার সময় 'ওয়ার্কিং মেনস অ্যাডভোকেট' পত্রিকায় লেখা হয়, "মিশর দেশের ক্রীতদাস প্রথার চেয়েও দুঃসহ অবস্থার মধ্যে রুটি কারখানার কারিগরেরা বছরের পর বছর কাটিয়ে থাকেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গড়ে আঠেরো থেকে কুড়ি ঘণ্টাই তাঁদের খাটতে হয়। লাগামহীন শোষণের এই ছিল সাধারণ ছবি আর "সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত" ছিল ন্যূনতম কাজের ঘণ্টা!

ফলে, কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে চলল ধর্মঘটের পর ধর্মঘট ১৮২০ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত। দশ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করেছিল গৃহনির্মাণ শিল্পের শ্রমিকেরা আর তারই প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে জন্ম নিয়েছিল দুনিয়ার প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন বলে খ্যাত ফিলাডেলফিয়ার মেকানিকদের ইউনিয়ন ১৮২৭ সালে।

ক্রমে দশ-ঘণ্টার আন্দোলন সারা আমেরিকা জুড়ে দ্রুত ব্যাপক আকার নিতে শুরু করল। এই আন্দোলনের চাপেই ১৮৩৭ সালে রাষ্ট্রপতি ভ্যান ব্যুরেনের আমলে সরকারী কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের

জন্য চালু হয় দশ-ঘণ্টা কাজের দিন। পরবর্তীকালে কয়েকটি শিল্পেও এই দাবি স্বীকৃত হয়। তারপরেই আসে আট-ঘণ্টার দাবি।

বিশেষ ক'রে গৃহযুদ্ধের (১৮৬১-৬২) পরে আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলন আরো অনেক বেশি জঙ্গী আকার ধারণ করে, কেন-না শোষণের মাত্রাও হয়ে উঠেছিল অসহনীয়। এব্রাহাম লিঙ্কন একটি বক্তৃতায় বললেন :

> "যা কিছু শ্রমিকের ক্ষতি করে, আমেরিকার প্রতি তা বিশ্বাস-ঘাতকতা। ছু'টির মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যায় না। যদি কেউ বলে যে সে আমেরিকাকে ভালবাসে, কিন্তু শ্রমিককে ঘৃণা করে, সে একজন মিথ্যাবাদী। যদি কেউ বলে যে সে আমেরিকাকে বিশ্বাস করে, কিন্তু শ্রমিককে ভয় করে, সে একজন নির্বোধ।
>
> শ্রমিকেরা যখন ইচ্ছে তখনি ধর্মঘট করতে পারে, এমন একটা শ্রম-ব্যবস্থা চালু থাকতে দেখে আমি খুশী।"

কিন্তু পুঁজিবাদী মহারথীরা সে কথায় কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেনি। সমাজের সমগ্র অর্থনীতিকে তাদের নিজেদের কবজায় আনতে তারা তখন ব্যস্ত। বিভিন্ন দেশ থেকে তখনো শ্রমিকেরা আসছে আমেরিকার 'স্বর্গরাজ্যে' মুক্তির আশায়। "জীবন, স্বাধীনতা ও সুখের সন্ধানে" সকলের সমান অধিকার আর "সব মানুষই সমান-ভাবে সৃষ্ট হয়েছে"—এই ঘোষণায় বিশ্বাস ক'রেই তারা এসেছিল আমেরিকায়। সরকারী হিসেবেই দেখা যায়, ১৮৮০ সাল থেকে দশ বছরে ৫২,৪৬,৬১৩ জন এসেছিল আমেরিকায় বসবাস করতে। এক একটা জাহাজে বে-আইনীভাবে হাজার হাজার মানুষকে পুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কাজ ও সুখী জীবনের আশা দিয়ে। শিশু, বৃদ্ধ ও রুগ্ন যাত্রীরা মরেছে দলে দলে জাহাজের মধ্যেই। যাওয়ার ভাড়া না দিলেও চলবে, পরে সে টাকা তুলে নেওয়া হবে তাদের

মাইনে থেকে। ফলে, প্রথম দিকে এইসব শ্রমিকেরা মাইনে পেতো না বললেই চলে আর তার উপরে ছিল হাড়-ভাঙা খাটুনি। ১২ ঘণ্টা থেকে ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত এরা কাজ করেছে ইস্পাত কারখানার চুল্লি:তে, অন্ধকার ও বিপদসংকুল খনির হাঁটু-জলে, গঠন করেছে রেলপথ, তৈরি করেছে রেলগাড়ি, ব্রিজ, বাঁধ. পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ-পথ, দলে দলে যোগ দিয়েছে কারখানায় আর উৎপাদন করেছে কয়লা, ইস্পাত, তেল, তামা ইত্যাদি। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির তারাই হল মেরুদণ্ড, অথচ তারাই ছিল শোষণের সেরা শিকার। এই দুঃসহ অবস্থার বিরুদ্ধে স্বভাবতই শ্রমিক আন্দোলনও এক বিরাট ও ব্যাপক আকার ধারণ করতে লাগল। ধর্মঘট ও পুলিসের গুলি ছিল এ যুগের একটা স্বাভাবিক ঘটনা। রক্তস্নাত শ্রমিক আন্দোলনই ছিল ঐ যুগের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তবু সেই আন্দোলনকে স্তব্ধ ক'রে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

১৮৭৭ সালের বিখ্যাত রেলশ্রমিক ধর্মঘটের পর বিভিন্ন জাতীয় রক্ষী বাহিনী (National Guards) ও রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনী-গুলিকে নতুন নতুন অস্ত্রে সজ্জিত করা হ'ল। শ্রমিক আন্দোলনের সাংবাদিক জোসেফ আর. বুকানান (Joseph R. Buchanan) লিখেছিলেন যে, হিসাব দপ্তরের মতোই এই সংস্থাগুলি ছিল শিল্পেরই একটা অঙ্গ।

কিন্তু অধিকাংশ খুন ও রক্তপাতই ঘটেছিল পিংকার্টন এজেন্সি নামক ব্যক্তিগত মালিকানাধীন একটি সংস্থার সশস্ত্র বাহিনীর হাতে। আশীর দশকে এই প্রতিষ্ঠানটি বৃহৎ পুঁজিপতির পর্যায়ে উঠে গিয়েছিল। ১৮৮৪ সালে অ্যালান পিংকার্টনের (Allan Pinkerton) মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠানটির কাজ চালিয়ে যান উইলিয়াম এ. পিংকার্টন (William A. Pinkerton) ও রবার্ট এ. পিংকার্টন (Robert A. Pinkerton), যথাক্রমে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল এজেন্সির কর্তা হিসেবে, আর তাঁদের কর্মকেন্দ্র ছিল শিকাগোয় ও

নিউ ইয়র্কে। ১৮৮৫ সালে এই দুই ব্যক্তি ইউনিয়ন-ভাঙার কাজে এজেন্সিকে ব্যবহার করার অনুরোধ জানিয়ে "রেলপথ কোম্পানিগুলি ও অন্যান্য কর্পোরেশনের কাছে" একটা গোপন সার্কুলার পাঠিয়েছিলেন: "...তাঁদের নিজস্ব কর্মচারীদের মধ্যে গোপন শ্রমিক সংগঠনের স্বার্থে যারা ঐ সব সংগঠনে যোগদানের জন্য ও ঘটনাচক্রে ধর্মঘট শুরু করার জন্য কর্মচারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে, সেইসব মতলববাজ লোকদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার কাজে।"

ধর্মঘট-ভাঙা ও গুপ্তচর বৃত্তির কাজে মালিকেরা ভাড়া খাটাতে পারত পিংকার্টন খুনে বাহিনীকে। এই ভাড়াটে সশস্ত্র বাহিনী ছিল তিন ভাগে বিভক্ত--পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ। ১৮৮৫ সালে জে গোল্ডের (Jay Gould) দক্ষিণ-পশ্চিম রেলপথে শ্রমিক ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য এই বাহিনী নিয়োগ সম্পর্কে সাংবাদিক জন সুইনটন (John Swinton) লিখেছিলেন: "এই অদ্ভুত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সশস্ত্র বাহিনীটি যুক্তরাষ্ট্র সরকার বা কোনো রাজ্য সরকারের সেবায় নয়—একচেটিয়াদের প্যাঁচের ফলে উদ্ভূত ধর্মঘটগুলো দমনের জন্য যেসব ব্যবসা-সংস্থা বা পুঁজিপতিরা ভাড়া দিতে পারে, তাদের সেবার জন্যই এটা রাখা হয়েছিল। ওহিয়োতে এটা ছিল হকিং কোল এ্যাণ্ড আইরন কোম্পানির বেতনভুক; গত বছর পেনসিলভানিয়ার কয়েকটি স্থানে কয়লা সংস্থাগুলির বেতনভুক ছিল; আর এবার মিসৌরিতে আমাদের সর্বময় কর্তা জে গোল্ডের বেতনভুক।"

সুইনটন আরো বলেছেন যে, এই পিংকার্টনেরা শুধু ধর্মঘট-ভাঙা ও গুপ্তচরগিরির কাজই করত না, উস্কানিদাতার কাজেও ছিল সিদ্ধহস্ত; শ্রমিক আন্দোলনকে অপদস্থ করার জন্য ও সদস্যদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে হিংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করত।

একদিকে যেমন মালিক, পুলিস ও ভাড়াটে খুনে বাহিনীর যৌথ

সন্ত্রাস, অন্যদিকে তেমনি খবরের কাগজে শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিষোদ্‌গার। ১৮৮৫ সালের খবরের কাগজ থেকে মাত্র দু'টি নমুনা দেওয়া যাক :

> "এইসব পাশবিক জীবগুলো শক্তি ছাড়া আর কোনো যুক্তিই বোঝে না এবং তা যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ করাই প্রয়োজন যাতে কয়েক পুরুষ ধরে তা মনে থাকে।" (নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন।)
> "এইসব ইউনিয়ন নাবিকদের উপর হাত-গ্রেনেড ছোঁড়া উচিত কেন না এমন ব্যবহারের ফলেই তারা পাবে মূল্যবান শিক্ষা এবং তাদের ভাগ্য দেখে সাবধান হবে অন্যান্য ধর্মঘটীরা।" (শিকাগো টাইমস।)

আজ যেসব ধনকুবেরদের নাম সারা দুনিয়ায় খ্যাত, তাঁরা সেই আশীর দশকেই সর্বময় একচেটিয়ার পথে যাত্রা ত্বরান্বিত করেছিল।

হেনরি ফোর্ড তখন তাঁর সাইকেলের দোকানে মেরামতের কাজে ব্যস্ত আর সেই কাজের মধ্যে তাঁর মনে এমন সব ভাবনার উদয় হচ্ছিল, যা পরবর্তীকালে আমেরিকার জীবনই বদলে দেবার ভূমিকা নিয়েছে।

রাজকীয় স্বভাবের মর্গান তখন একটার পর একটা রেলপথ পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছেন, সেগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে চলেছেন আর সেই কাজের মধ্য দিয়ে শিল্পের পুঁজি আর ব্যাংকের পুঁজি একত্র ক'রে একটা নতুন দিগন্তের উদ্বোধন করলেন।

কিন্তু শ্রমিকদের ব্যাপারে অধিকাংশ একচেটিয়াই জে গোল্ডের সাথে একমত ছিলেন : "যোগান ও চাহিদার নিয়মেই যা পরিশেষে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হবে, এমন একটি পণ্যই হল শ্রম।" ১৮৮৩ সালে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের তদন্তকারী একটি সেনেট কমিটির কাছে একজন শ্রমিক বলেছিলেন, "মালিক তার যন্ত্রপাতিকে যে চোখে দেখে, বেশ কিছুটা তেমনিভাবেই দেখে তার লোকজনকে।

সে চায় সবচেয়ে শস্তায় তার লোকজনের কাছ থেকে যতখানি সম্ভব আদায় ক'রে নিতে।" ঐ কমিটির কাছেই স্যামুয়েল গম্পার্স (Samuel Gompers) জানান যে, একজন মালিক তাঁকে বলেছিলেন: "আমার সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করার কাজে একটা যন্ত্রের মতোই আমার কর্মচারীদের দেখি, আর তারা যখন বুড়ো বা অকেজো হয়ে যায়, আমি তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিই রাস্তায়।"

সেই যুগে আমেরিকাবাসীদের কাছে জে গোল্ডই ছিলেন এক-চেটিয়ার প্রতীক। বেশ কয়েকটি রেলপথ, টেলিগ্রাফ কোম্পানি, জাহাজ কোম্পানি ইত্যাদি ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের কায়দাও ছিল অপূর্ব শঠতায় ভরা। ক্ষতিগ্রস্ত রেলপথগুলো তিনি কিনে নিতেন অল্প দামে আর ভান করতেন, সেগুলো হবে অত্যন্ত লাভজনক। অন্য মালিকদের মনে বিশ্বাস জন্মানোর সাথে সাথেই তা বিক্রি করতেন চড়া দরে। এই কায়দায় শুধু ইউনিয়ন প্যাসিফিক (Union Pacific) থেকেই তাঁর আয় হয়েছিল দু'কোটি ডলার। এই ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথেই ১৮৮৫ সালে হয়েছিল প্রথম সফল রেলশ্রমিক ধর্মঘট। কিন্তু ১৮৮৬ সালে যখন তাঁর দক্ষিণ-পশ্চিম রেলপথে ধর্মঘট হ'ল, তিনি কিনে নিলেন পাউডারলি'র মতো নেতাদের। আর, ঐ ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়ার ফলেই রোগে ও কপর্দকহীন অবস্থায় মারা গেলেন আত্মভোলা নির্ভীক সমাজতন্ত্রী মার্টিন আইরন্স (Martin Irons)। ধর্মঘটের হুমকির উত্তরে একবার এই জে গোল্ডই নিদারুণ অবজ্ঞার সাথে বলেছিলেন, "শ্রমিক শ্রেণীর অর্ধেককে আমি ভাড়া করতে পারি বাকী অর্ধেককে খুন করার জন্য।" ধর্মঘটীদের গুলি ক'রে মারার জন্য পিংকার্টনদের হাতে প্রচুর অর্থ তুলে দিতে তিনি রাজী, কিন্তু শ্রমিকদের মাইনে বাড়ানোর জন্য এক কপর্দকও নয়—এই ছিল তাঁর নীতি। নানা কায়দায় বেপরোয়া লুঠের পর শাস্তির সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যাবার জন্যই শেষ পর্যন্ত তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে পালালেন! তারপর থেকে

রাতে তাঁর ঘুম হ'ত না বললেই চলে, প্রায়ই ভোর পর্যন্ত পথে পথে হেঁটে বেড়াতেন, কাশতেন আর রক্তবমি করতেন।

এই প্রসঙ্গে জন ডি. রকফেলারের (John D. Rockfeller) নামটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি কী চান, তা জানতেন। আর, তাঁর চাওয়ার তীব্রতা প্রায় হিংস্রতার পর্যায়ে পড়ে। স্বভাবে গোপনীয়তা-প্রিয়, মৃদুগতি, সম্ভব হলে ফিসফিস ক'রে কথা বলতে ভালবাসতেন, অর্থের সম্পর্ক না থাকলে বিনয়ের অবতার এবং প্রয়োজনবোধে বাঘের মতোই হিংস্র। 'ষড়যন্ত্রের একটা সহজাত প্রবৃত্তি' ছিল তাঁর। ১৮৮১ সালে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম আধুনিক ট্রাস্ট—স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানি (Standard Oil Company) —প্রতিষ্ঠার সময় তিনি আইনের কোনো তোয়াক্কাই করেননি।

প্রতিদ্বন্দ্বীদের বেলায় রকফেলার ছিলেন নির্মম নিষ্ঠুর; অনুশোচনার কোনো বালাই ছিল না তাঁর। তিনি অতি সহজ সুরেই বলতেন যে, ঈশ্বর তাঁকে টাকা কামানোর জন্যেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং যাঁরা তাঁর পথরোধ করছেন, তাঁরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই ব্যাহত করছেন।

প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঠকানো ও লাটে ওঠানোর কাজে তিনি ছিলেন একাগ্র, সুপটু ও অব্যর্থ। তাঁর পরিকল্পনাকে সার্থক করার জন্য যে কোনো অপকর্মই তাঁর কাছে পবিত্র।

একবার রকফেলারের কাছে ক্লিভল্যাণ্ড থেকে মিসেস বাকাস (Mrs Backus) তাঁর তৈল-শোধনকারী স্বামীর মৃত্যুর পর এসেছিলেন নিরাপত্তার আশায়। বিধবাটির দুঃখে সমবেদনা জানিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন রকফেলার। পরে স্থির করলেন যে, তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনার স্বার্থে ঐ বিধবার সম্পত্তি তাঁর প্রয়োজন। অবশেষে দু'লাখ ডলারের সম্পত্তিটি উন-আশী হাজার ডলারে বিক্রি করতে বাধ্য করলেন ঐ বিধবাকে!

এ সব ঘটনা নিয়ে তাঁকে তিরস্কার করলে রকফেলার বলতেন,

"আমার পরিকল্পনা পরিষ্কারভাবেই ছিল আমার মনে। সেটা ছিল সঠিক। আমার বিবেকের বিষয় বলেই আমি তা জানতাম। আমি ও আমার ঈশ্বরের মধ্যে সেটা ছিল সঠিক। পরের দিন যদি তা করতে হ'ত, তাহলে আমি আবার তা একইভাবে করতাম—একশো বার করতাম।"

জোসেফসনের (Josephson) মন্তব্যটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ : "এ যুগের সেরা অপরাধীদের সাথে নয়, নিয়তির সাথেই মোকাবিলা করতে হচ্ছে, সাধারণ মানুষ এই প্রত্যয়ে পৌছানোর আগে চল্লিশ বছর ধরে স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েলের লোকেরা স্বেচ্ছাপরাধীদের মতো মামলার পর মামলায় যাত্রা করেছে।"

সারা আশী দশক জুড়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এই প্রচণ্ড গতিবেগ ও নির্মম শোষণ কী অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তা ধরা পড়েছিল ১৮৯০ সালের সরকারী হিসাবে : "জাতির সমস্ত পরিবার গুলির মাত্র এক-অষ্টমাংশ ভোগ করেছে জাতীয় আয়ের অর্ধেক। দরিদ্রতম ৫০ শতাংশের মোট আয়ের চেয়েও অনেক বেশি আয় করেছে বিত্তবান এক-শতাংশ। সারা দেশের এক কোটি বিশ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৫৫ লক্ষ পরিবারের কোনো সম্পত্তিই নেই।"

—:—

রিক্তদের দৃপ্ত নেতা সিলভিস

উইলিয়াম এইচ. সিলভিস (William H. Sylvis) আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনে একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮২৮ সালে পেনসিলভানিয়াব একটি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে। সেই পরিবারের দশটি সন্তানেব মধ্যে সিলভিস ছিলেন একজন। ১৮৫৭ সালে ফিলাডেলফিয়ার লোহা ঢালাই শ্রমিকদেব ইউনিয়নে যোগ দেবাব আগে বছরের পর বছব তাঁর জীবন কেটেছে একঘেয়ে হাড়-ভাঙা খাটুনি আর তিক্ততার মাঝে। ইউনিয়নে যোগদানের পব তিনি পেলেন এক নতুন জীবন, নতুন আশা, নতুন জীবনদর্শন। উচ্ছ্বাসভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আমি এই ইউনিয়ন আদর্শকে ভালবাসি। আমাব পবিবাব বা আমার জীবনের চেয়েও তা আমার কাছে বেশি প্রিয়। নিজেব সত্তা বা পৃথিবীব কাছে আমাব যা কিছু কামনা, সবকিছুই আমি এব জন্য দিতে রাজী।"

কিন্তু দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্য সাথী। ঘরে প্রায়ই তাঁর পাঁচটি ক্ষুধার্ত সন্তানের অন্ন জুটত না। দুশ্চিন্তায় আর রোগে তাঁর স্ত্রী হয়ে পড়তেন দিশেহারা। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টিপাত করার সময় কোথায়? ইউনিয়ন গড়ার কাজে সবসময়েই ঘটনার কেন্দ্রস্থলে থাকতেন তিনি। জীবনে যেন সার্থকতার পথ খুঁজে পেলেন।

এদিকে শুরু হয়ে গেল আমেরিকার গৃহযুদ্ধ। সিলভিস বসে থাকার পাত্র নন। ঢালাই শ্রমিকদের মধ্য থেকে ইউনিয়ন সদস্যদের নিয়ে গড়ে তুললেন এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যুদ্ধে যোগদানের আশায়। তিনি নির্বাচিত হলেন একজন লেফটন্যান্টের পদে। কিন্তু যুদ্ধে রওনা হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অত উত্তেজনার মধ্যেও তাঁর স্ত্রীর আকুতি আর

অগ্রাহ্য করা গেল না। ঘরে পয়সা নেই, শিশুদের খাবার নেই। তাঁর স্ত্রী ও শিশুরা বাঁচবে কী করে? তাই ব্যাণ্ড বাজিয়ে সিলভিসের বাহিনী যখন গাড়িতে উঠেছে, তখন সেনাপতিকে বিমর্ষ মনে ফিরে যেতে হ'ল ঢালাই কারখানায় ও পারিবারিক জীবনে। এটা তাঁর কাছে এক অসহনীয় ঘটনা। তিনি আবার গঠন করলেন আরেকটি বাহিনী এবং ১৮৬১ সালে পেনসিলভানিয়া যখন আক্রমণের মুখে, তখন তিনি রণক্ষেত্রে গেলেন একজন সার্জেন্ট হয়ে। কিন্তু তিনমাস পরেই আবার ফিরে আসতে হ'ল সংসারটিকে বাঁচানোর তাগিদে। তিক্ততা তাঁর সারা মনটাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিল। বন্ধুরা সবাই চলে গেছে রণক্ষেত্রে। মাত্র দু'বছর আগে ঢালাই শ্রমিকদের যে জাতীয় ইউনিয়নটি গড়ে তোলায় তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস, সেই ইউনিয়নটিও গেল অদৃশ্য হয়ে, কেননা সদস্যরা সবাই গেছে যুদ্ধে।

রণক্ষেত্রে যখন অসীম বীরত্বের প্রকাশ হচ্ছে, তখন তার বাইরে চলেছে অপরিসীম প্রবঞ্চনা। যখন বাপেরা, স্বামীরা, যুবকেরা মরণপণ লড়াইতে ব্যস্ত, তখন হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মহিলা ও শিশুরা জীবিকার তাগিদে কাজ করতে এসেছে কারখানায়। আর, এইসব নতুন শ্রমিকদের আগের চেয়ে অনেক কম মাইনেতে খাটিয়ে মালিকেরা লুটেছে মুনাফা। যে সব শিশুদের স্কুলে যাবার কথা, তারা এসেছে কারখানায় আর কাজ করতে করতে ঘুমে এলিয়ে পড়েছে মেসিনের পাশে। মেয়েরা ভোর থেকে মাঝ-রাত পর্যন্ত খাটছে আর অজ্ঞান হয়ে পড়েছে সেইখানেই। নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন, নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ইত্যাদি কাগজে তা পড়ে চলেছেন অসহায় নিরুপায় সিলভিস আর নিজেও দিনে ১২ ঘণ্টা ক'রে কারখানায় খেটে চলেছেন নিজের সংসারটাকে কোনোমতে টিকিয়ে রাখার তাগিদে। কিন্তু এই অত্যাচারের বন্যা বেশিদিন চলতে পারেনি। ১৮৬২ সালের শেষদিকে আবার শুরু হ'ল ধর্মঘটের জোয়ার। সিলভিস আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন সংগঠনের কাজে।

১৮৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে পিট্‌স্‌বার্গে সিলভিসের উদ্যোগেই পুনর্গঠিত হল ন্যাশনাল মোল্ডার্স ইউনিয়ন। সিলভিস হলেন সভাপতি এবং এই কাণ্ডজে সংগঠনটিকে জীবন্ত ক'রে তোলার ভার পড়ল তাঁর ওপর। আমেরিকার ইতিহাসে এই প্রথম সারাদেশ ঘুরে জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা। মাত্র ১০০ ডলার হাতে নিয়ে প্রায় দশ হাজার মাইল পরিক্রমার চেষ্টা হ'ল। টাকা ফুরিয়ে গেছে, তবু এক শহর থেকে অন্য শহরে বহন ক'রে নিয়ে চলেছেন ইউনিয়নের আদর্শ। কখনো রেলপথের ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে প্রার্থনা করেছেন বিনা ভাড়ায় চলাচলের জন্য, কখনো থেকেছেন অভুক্ত আর ছেঁড়া জামাকাপড় প'রেই কাটিয়েছেন সারা পথটা। পরবর্তীকালে নিজেই বলেছেন, তিনি কোনোদিনই এত সুখী হননি, কেননা বহুদিন ধরে তিনি যা করতে চেয়েছেন, তা করছিলেন সেই সময়।

তিনি শুধু প্রথম জাতীয় ইউনিয়নগুলির মধ্যে একটির প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, প্রথম জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি। যে সব নীতির জন্য তাঁকে সারা জীবন লড়তে হয়েছে, তার মধ্যে ছিল ঃ নিগ্রো শ্রমিকদের সাথে সংহতি, সমান কাজের জন্য মেয়েদের সমান মজুরি, ট্রেড ইউনিয়নে মেয়েদের প্রবেশাধিকার, শ্রমিক, কৃষক ও নিগ্রোদের স্বাধীন রাজনৈতিক কর্ম এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি। একদিকে প্রচণ্ড দারিদ্র্য আর অন্যদিকে প্রবল কর্ম-প্রেরণা, উদ্যম ও প্রচেষ্টা—এই দুটোর মিলনেই তাঁর মৃত্যু হ'ল মাত্র ৪১ বছর বয়েসে।

১৮৬৬ সালের অগাস্টে বাল্টিমোরে ৬০টি ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা যে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন গঠন করে, সেটাই আমেরিকার ইতিহাসে শ্রমিকদের প্রথম জাতীয় ফেডারেশন। তার উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিলভিস। সেই প্রতিষ্ঠা সম্মেলনই নিয়েছিল আট-ঘণ্টার দাবির ঐতিহাসিক প্রস্তাব :

"এই দেশের শ্রমিককে পুঁজিবাদী দাসত্বের হাত থেকে মুক্ত করার

জন্য, বর্তমানের প্রথম ও বিরাট প্রয়োজন এমন একটা আইন পাশ করা, যার ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাজ্যগুলিতে আট ঘণ্টাই যেন স্বাভাবিক কাজের দিন বলে গণ্য হতে পারে। যতদিন এই গৌরবময় ফল অর্জন করতে না পারি, ততদিন আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগের সংকল্প নিচ্ছি।"

তা ছাড়া, "শিল্পে নিযুক্ত শ্রেণীগুলির স্বার্থরক্ষা ও প্রতিনিধিত্ব করার সংকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্যক্তিদের নির্বাচনে"র জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয় ঐ সম্মেলনে।

তবু ঐ সম্মেলনে সিলভিস ব্যর্থ হলেন নিগ্রো-শ্রমিক সংহতির প্রশ্নে। নিগ্রোদের সম্পর্কে তিনি লিখলেন, "আমরা যদি আমাদের সাথে এই লোকদের সমস্বার্থের কথা বোঝাতে সমর্থ হই···আমরা পাব একটা শক্তি···যা ওয়াল স্ট্রিটের পায়ের তলা কাঁপিয়ে তুলবে।" ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "সঙ্গীহীনা বিধবা বা সাদা চামড়ার সুদক্ষ মিস্ত্রি বা অজ্ঞ কৃষ্ণকায়—অন্যায় যার প্রতিই হোক না কেন, লুণ্ঠনকারী ও লুণ্ঠিতের মধ্যেই আছে পার্থক্যের সীমারেখা। পুঁজি কখনো ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করে না এবং তার স্বরূপটাই এমন যে শ্রমিক শ্রেণীর সবাইকে হেয় না ক'রে মাত্র তার একাংশকে হেয় করা নিছক অসম্ভব।"

কিন্তু বাল্টিমোরে যে প্রতিনিধিরা জড়ো হয়েছিলেন, তাঁদের মনে এই যুক্তি বিশেষ কোনো নাড়া দিল না, কেননা অধিকাংশের মনেই নিগ্রোদের সম্পর্কে তখনো রয়েছে প্রবল কুসংস্কার।

১৮৬৭ সালে "আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের" কাছে আবারো একটি আবেদনে লিখলেন, "নিগ্রোরা সংখ্যায় চল্লিশ লাখ এবং দুনিয়ার ঐ সংখ্যক যে কোনো জনসমষ্টির চেয়ে বেশি সংখ্যায় এরা হাতের কাজ করে। আমরা কি তাদের প্রদত্ত সহযোগিতাকে বর্জন করতে ও তাদের শত্রু বলে গণ্য করতে পারি? এমন নির্বোধের কাজ করলে শ্রম-সংস্কারের উদ্দেশ্যকে পুঁজির সম্মিলিত প্রচেষ্টা যে

আঘাত হানে, তার চেয়েও গুরুতর আঘাত আমরাই হানবো।…তাই উত্তরের ও দক্ষিণের পুঁজিপতিরা শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়ের মধ্যে সংঘাতকে উস্কে দেবে এবং একজনকে লাগিয়ে দেবে অপরের বিরুদ্ধে, নিজেদের ক্রমোন্নতিকে রক্ষা করার এবং অত্যাচারের রাজত্বকে বজায় রাখার স্বার্থ ও সুযোগের প্রয়োজনে।"

ঐ একই সময়ে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মেয়েদের যোগ দেবার অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও সমানে চালিয়ে গেছেন ঃ

> "যাঁরা মজুরি-মানে সমতা রক্ষার জন্য ও শ্রমের মর্যাদার জন্য লড়াই করছে, সেই আমরা নারী শ্রমিকদের ও নিজেদের অধিকারকে পাহারা দেওয়া ও রক্ষা করার জন্য মানবতার কাছে না হলেও অন্তত যৌক্তিকতার কাছে ঋণী। যে সামাজিক বিকাশ আমাদের সকলেরই লক্ষ্য, তার অগ্রগতিতে আমাদের সাথে নারীদের সহচরী না ক'রে আমরা কেমন ক'রে সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর আশা করতে পারি ?"

গৃহযুদ্ধের সময় গৃহস্থালীর পরিবর্তে মেয়েরা বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল কল-কারখানায় আর সামান্য মজুরিতেই তারা কাজ করত। ফলে, মজুরির হার গিয়েছিল কমে। সেই কারণে অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়নই ছিল নারী শ্রমিকের বিরুদ্ধে। কিন্তু সিলভিসের নেতৃত্বে অবশেষে নারী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যপদ দেবার ও সম্মেলনে তাদের প্রতিনিধি পাঠানোর নীতি, সমান কাজের জন্য সমান বেতন ও মেয়েদের জন্য আট ঘণ্টা কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নে।

১৮৬৭ সালের সম্মেলনে নিগ্রোদের সদস্যপদ লাভের অধিকারকে আবারো এড়িয়ে যাওয়া হ'ল। ১৮৬৮ সালের সম্মেলন যদিও সিলভিসকে সভাপতির পদে নির্বাচিত করল, নিগ্রোদের প্রশ্নটি কিন্তু বাদ রয়ে গেল। ১৮৬৯ সালের সম্মেলনের ঠিক প্রাক্কালে মাত্র ৪১ বছর বয়সে সহসা মারা গেলেন সিলভিস। অথচ ১৮৬৯ সালের সম্মেলনটিই সিলভিসের গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জীবিত

অবস্থায় সহকর্মীদের কাছে যে নীতি বোঝাতে তিনি অক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে তাঁরা সেকথা বুঝলেন এবং প্রস্তাবে ঘোষণা করলেন: "শ্রমিকদের অধিকারের প্রশ্নে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, শ্বেতকায়-কৃষ্ণকায় বা স্ত্রী-পুরুষ কোনো ভেদই জানে না ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন এবং আমাদের কৃষ্ণকায় সহকর্মীদের কাছে সমস্ত বৈধ উপায়ে সংগঠন গড়ার ও পরবর্তী কংগ্রেসে প্রত্যেক রাজ্য থেকে ইউনিয়নের প্রতিনিধি পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছে।"

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির প্রচেষ্টাও সিলভিসের জীবনে এক বিরাট কীর্তি। তিনি চেষ্টা করছিলেন ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নকে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির (International Workingmen's Association) অন্তর্ভুক্ত করতে। অবশেষে তাঁরই প্রভাবে ১৮৬৭ সালে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিকের পরবর্তী কংগ্রেসে যোগদানের জন্য ট্রেভেলিককে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়।[১] আরো উল্লেখযোগ্য, ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কে এই ইউনিয়নের তৃতীয় কংগ্রেসে একটি স্বতন্ত্র শ্রমিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং দাবি করা হয়: যারা চাষ করে, শুধু তাদের হাতেই জমি দিতে হবে, শ্রমিক দপ্তর গঠন করতে হবে, আট-ঘণ্টা কাজের দিন সম্পর্কে আইন এবং স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার মানতে হবে। ঐ কংগ্রেস থেকে আন্দোলনে যোগদানের জন্য নিগ্রোদের কাছে আহ্বান জানানো হয়।[২] ১৮৬৯ সালে সাধারণ পরিষদের আমন্ত্রণে আন্তর্জাতিকের বেল কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠানোর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সহসা সিলভিসের মৃত্যু হয় এবং তার জায়গায় শিকাগো থেকে প্রকাশিত 'ওয়ার্কিং মেনস অ্যাডভোকেট' পত্রিকার সম্পাদক এ. সি ক্যামেরন ও লুকার প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হন।[৩] সিলভিসের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার পরেই আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের সদস্যদের কাছে এক শোক-বার্তা পাঠানো হয়:

"শুভ আদর্শে অনুপ্রাণিত একজন, বিশ্বস্ত, অধ্যবসায়ী ও ক্লান্তিহীন কর্মী, আপনাদের সম্মানিত ও যোগ্য সভাপতি উইলিয়াম এইচ. সিলভিস-কে মৃত্যু আপনাদের মধ্য থেকে এত অপ্রত্যাশিতভাবে ও অকালে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল, সেই দুঃসংবাদ আমাদের মনকে অবর্ণনীয় শোক ও দুঃখে আচ্ছন্ন করেছে। জীবনের চরম দীপ্তির সময় তাঁর মতো পরীক্ষিত সংগ্রামীদের হারানো শ্রমজীবী ভাই ও বোনেদের সংহতির কাছে অসহনীয়, সেই ক্ষতির শোকে আমরাও সমানভাবে মর্মাহত। যদিও যোগ্য পরামর্শদাতা ও পরীক্ষিত নেতাদের যথেষ্ট প্রাচুর্য নেই, তবু আপনাদের সদস্যদের মধ্যে তাঁর পরিবর্তে কাজ চালিয়ে যাবার মতো ইচ্ছুক ও যোগ্য লোক আছেন এবং তাঁদের একই রকম উদ্দীপনা ও নিষ্ঠা আছে, এটা জেনে আমরা সান্ত্বনা পাই। আমরা আগে থেকেই নিশ্চিত যে আপনাদের বর্তমান অধিবেশন যথাযথ পদের জন্য যথোপযুক্ত লোক নির্বাচন করবেন এবং বিরাট সংগ্রামকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাবার ও তার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করার সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।"[৪]

তা ছাড়া, আন্তর্জাতিকের চতুর্থ বার্ষিক কংগ্রেসে মার্কসের লেখা সাধারণ পরিষদের যে রিপোর্টটি পেশ করা হয়, তাতে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর শেষ চিঠিখানার উদ্ধৃতি ছিল। সিলভিসের সেই চিঠিখানাও ছিল অনবদ্য :

"ঠিকানা সহ আপনার ১২ তারিখের চিঠিখানা গতকাল আমার কাছে এসে পৌঁচেছে। সমুদ্রের ওপার থেকে আমাদের সাথী শ্রমজীবীদের এমন সহৃদয় বার্তা পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি : আমাদের উদ্দেশ্য অভিন্ন। এটা হল দারিদ্র্য ও সম্পদের মধ্যে লড়াই : দুনিয়ার সব প্রান্তেই শ্রমের সমান হীন অবস্থা আর পুঁজির একই অত্যাচারী রূপ। তাই আমি বলি, আমাদের উদ্দেশ্য অভিন্ন। আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে আপনি যাদের প্রতিনিধি, তাদের সবাইকে আর ইউরোপের সমস্ত পদদলিত ও নিপীড়িত খেটে-খাওয়া ছেলেমেয়েদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমজীবীদের

পক্ষ থেকে আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি সহযোগীর ডান হাত। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের প্রচেষ্টা চরম গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য অর্জন না করে, আপনাদের আরব্ধ শুভ কর্মে আপনারা এগিয়ে চলুন। সেটাই আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আমাদের বিগত যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর বুকে তৈরি হয়েছে অত্যন্ত জঘন্য অর্থাশ্রয়ী আভিজাত্য। এই অর্থ-শক্তি জনগণকে দ্রুত নিঃশেষ ক'রে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছি এবং আমরা জিততে চাই। যদি পারি, ব্যালট-বাক্সের মাধ্যমেই জিতব; তা না হলে কঠোর পন্থা নেব। বেপরোয়া পরিস্থিতিতে কিছুটা রক্তক্ষরণও কখনো কখনো প্রয়োজন।"৫

সিলভিসের মৃত্যুর পর তাঁকে কবর দেওয়ার অর্থও ছিল না তাঁর পরিবারের হাতে, ধার করেই সে কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছিল। তাঁর জীবনে ছিল প্রচণ্ড দারিদ্র্য আর ছিল আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি অসীম ভালবাসা। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি নিজেই বলেছিলেন, "মানবতা ও সমাজ-সংস্কারের স্বার্থে আমার বিনীত প্রচেষ্টাকে সর্বত্র আমার সাথী শ্রমজীবীরা যে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তা জানতে পারা আমার কাছে আন্তরিক গর্বের বিষয়।"

তাঁর মৃত্যুর পরেই ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের আয়ু ক্ষীণ হয়ে এল, বিশেষ ক'রে ট্রেড ইউনিয়ন নীতির থেকে বিচ্যুতির ফলে। ১৮৭২ সালের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মাত্র সাতজন প্রতিনিধি। তারপর থেকে আর কোনো সম্মেলন হয়নি। কিন্তু যে আন্দোলন ও নীতির জন্য তিনি আজীবন লড়েছেন, তার কোনো লয় নেই।

তাঁর মৃত্যুর বছরেই অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হ'ল আরেকটি ফেডারেশন—নাইটস অব লেবার (Knights of Labor) নামে। পরবর্তীকালে সেই ফেডারেশনই শ্রমিক শ্রেণীর বিপুল শক্তির আধার হয়ে দেখা দিয়েছিল।

অপরাজেয় পার্সনস

মে দিবসের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র—অ্যালবার্ট আর. পার্সনস (Albert R. Parsons)। ফাঁসির মঞ্চ থেকে তিনিই চেঁচিয়ে বলেছিলেন, "জনগণের কণ্ঠস্বর শোনা হোক!"

তাঁর বাবা রেভারেণ্ড জোনাথন পার্সনস (Rev. Jonathan Parsons) ছিলেন গোঁড়া খৃস্টান সম্প্রদায়ের এক নির্ভীক ও অসাধারণ যাজক। মায়ের নাম ছিল এলিজাবেথ টমকিনস। তাঁদের তৃতীয় সন্তান অ্যালবার্ট জন্মেছিলেন ১৮৪৮ সালের ২০শে জুন তারিখে। অ্যালবার্টের যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়েস, তখন তাঁর বাবা-মা দু'জনেই বিদায় নিলেন জীবন থেকে। অ্যালবার্ট চলে এলেন দাদা উইলিয়ামের কাছে। তখন এস্থার মাসী (Aunt Esther) নামে একজন নিগ্রো ক্রীতদাসীই এই নাবালক অসহায় শিশুটিকে মায়ের স্নেহ দিয়ে লালন করেছিলেন। হয়তো এই ঘটনাই তাঁর জীবনে প্রবল প্রভাব সৃষ্টি করেছিল।

মাত্র এগারো বছর বয়েসে অ্যালবার্ট ডেইলি নিউজ (Daily News) পত্রিকার প্রেসে যোগ দিয়েছিলেন একজন শিক্ষানবীশ হিসেবে। গৃহযুদ্ধ যখন শুরু হয়ে গেল, তখন তাঁর বয়েস মাত্র তেরো, কিন্তু তবু নাছোড়বান্দা হয়ে নাম লেখালেন অশ্বারোহী দলে। চার বছর পর্যন্ত চালিয়ে গেলেন লড়াই। তারপর সতেরো বছর বয়েসে ফিরে এলেন ঘরে।

আবার দেখা হল সেই এস্থার মাসীর সাথে। ক্রীতদাসেরা তখন মুক্ত হয়েছে। অ্যালবাট তাকাতে পারলেন না মাসীর চোখের দিকে। এই মাসী সম্বন্ধেই অ্যালবার্ট বলেছেন যে তিনি "ছিলেন আমার নিত্য সহচরী আর সর্বদাই দিয়েছিলেন মায়ের স্নেহ"। কিছুকাল পরে মাসীর সাথে অজস্র গল্প হ'ল আর তার ফলেই হয়তো অ্যালবার্টের জীবনটাও গেল বদলে।

অজস্র ভীতি, শাসানি, এমন কি জীবননাশের হুমকিও অগ্রাহ্য ক'রে অ্যালবার্ট স্পেকটেটর (Spectator) নামে একটা কাগজ প্রকাশ করলেন নিগ্রোদের অধিকার নিয়ে প্রচার ও আন্দোলনের উদ্দেশ্যে আর লিখে চললেন দিনের পর দিন।

সেই সময়েই একবার ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলেন টেক্সাসে (Texas)। সেখানে জনসন কাউন্টিতে তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল এক সুন্দরী মেক্সিকো-ভারতীয় যুবতীর সাথে। নাম তাঁর লুসি এলডিন গোঞ্জেলস (Lucy Eldin Gonzales)। বর্ণ-বিদ্বেষের বেড়াজাল গেল ভেঙে। অ্যালবার্ট ভালবেসে ফেললেন লুসিকে। ১৮৭৩ সালে তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল। প্রথমে গেলেন ফিলাডেলফিয়ায় আর তার কিছুদিন পরেই শিকাগোতে। "অশ্বেতকায় মহিলা" বলে লুসির প্রতি নানা মহল থেকে অবজ্ঞার উক্তি শোনা গিয়েছিল। হয়তো সেজন্যই এই দম্পতি চলে গিয়েছিলেন শিকাগোর বিদেশী পল্লীতে। বিদেশ-জাতদের সাথে তাঁদের এমন ঘনিষ্ট যোগাযোগের কারণও হয়তো তাই।

শিকাগোয় তখন শ্রমিক আন্দোলনের ঝড় উঠছে। মিছিলে মিছিলে শহর হয়ে উঠছে আলোড়িত, সভার পর সভায় বক্তারা খেটে-খাওয়া মানুষের দুঃসহ অবস্থার কথা তুলে ধরছেন, কাগজে কাগজে কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, অ্যানার্কিস্ট ইত্যাদি কথাগুলো ছাপানো হচ্ছে। পার্সনস দম্পতিও তা বোঝার চেষ্টা করলেন প্রাণপণে। অবশেষে ১৮৭৬ সালে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শে গঠিত সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে যোগ দিলেন অ্যালবার্ট।

পরের বছর বিখ্যাত রেলশ্রমিক ধর্মঘটে অ্যালবার্ট ছিলেন সবচেয়ে সক্রিয়। দৈনিক বার ঘণ্টা কাটতো এই কাজে। একদিন সকালে ধর্মঘটীদের এক সভায় বক্তৃতা দেওয়ার পরে বিকেলের খবরের কাগজে তাঁকে "মার্কিন কমিউনের নেতা" বলে অভিহিত করা হল। সেই

দিনই সন্ধ্যায় পুলিশের বড় কর্তা তাঁকে ডেকে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে একদল প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর সামনে জেরা করলেন। তারপর দরজার কাছে এসে তাঁকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেবার সময় ঐ বড় কর্তাই বললেন, "তোমার জীবন বিপন্ন। ট্রেড বোর্ডের লোকেরা ওখানে বসে আছে, তোমাকে ল্যাম্প-পোস্টে না ঝুলিয়ে তারা ছাড়বে না। ভালো চাও তো শহর থেকে পালাও আর বেরিয়ে যাও এখুনি।"

অ্যালবার্ট কিন্তু শহর ছেড়ে পালালেন না। আমেরিকায় ঐ সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি ঐ শিকাগোয় তিনি তাঁর যোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চললেন। তাঁর সেই নাটকীয় উচ্ছ্বাস, অনাবিল সততা, গান ক'রে বক্তৃতা শুরু আর কবিতা ও তথ্যের অপূর্ব সমাবেশ—এসব মিলে তাঁকে একজন অত্যন্ত প্রিয় শ্রমিক বক্তায় পরিণত করেছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, গান গাইতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন, গড়নে খাটো ও পাতলা, স্বভাবে উদার ও দাম্ভিক, ওস্তাদ ঘোড়সওয়ার, বন্দুক চালনায় পাকা হাত, কালো গোঁফের বিস্তারে ও চাকচিক্যে গর্বিত। তাঁকে মিথ্যাবাদী বললে আর রেহাই নেই। জ্ঞানের তৃষ্ণা ও কৌতূহল ছিল অনিবার্য। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সৎ লোকের কাছে চিন্তায় ও কর্মে কোনো পার্থক্য থাকতে পারে না। ফলে, বয়েস যতই বেড়েছে, ততই হয়েছেন আপোসহীন।

সমাজের অশুভ রোগগুলোর কারণ খুঁজে বের করার কাজে তিনি ও লুসি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁরা দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু জীবনকে উপভোগ করেছেন, দু'জনের অপূর্ব সাহচর্যে দু'জনেই হয়েছেন উদ্দীপিত। দু'টি সন্তান—ছেলে অ্যালবার্ট আর মেয়ে লুলু—স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত দু'জনে মিলে একসাথে পড়তেন মার্কস মর্গান ইত্যাদির লেখা, তারপর বেরিয়ে যেতেন আন্দোলনের জায়গায় বা সভামঞ্চের দিকে। তা ছাড়া, বিদেশ-জাত ও স্বদেশ-জাত শ্রমিকদের মধ্যে একটা সেতুর কাজও করত পার্সনসের ব্যক্তিত্ব।

১৮৮৪ সালে পার্সনস অ্যালার্ম (Alarm) নামে মুখপত্রটির সম্পাদক হন। লুসি প্রায়ই লিখতেন সেখানে।

১৮৮৬ সালে তাঁর বয়েস যখন আটত্রিশ, তখন তিনি সারা দেশের একজন অভিজ্ঞ শ্রমিক নেতা ও সংগঠক হয়ে উঠেছেন। ১৮৭৬ সালেই তিনি নাইটস অব লেবার (Knights of Labor) সংগঠনে যোগ দেন। দশ বছরে সারা দেশে ছোট-বড় অজস্র সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন, কখনো শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে, কখনো বা সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের পক্ষ থেকে। আর, সংগঠন গড়ে তুলেছেন দিকে দিকে। ফলে, লাখে লাখে খেটে-খাওয়া মানুষের সাথে সরাসরি সংযোগ হয়েছিল তাঁর।

১৮৮৩ সালেই পার্সনস, স্পাইজ ও অন্যান্যেরা সারা দেশ জুড়ে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির (International Working Men's Association) সংগঠন গড়ে তোলেন আর এই সমিতিও তার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করেছিল আট ঘণ্টার লড়াইকে জোরদার করার জন্য। তখন শিকাগো আট-ঘণ্টা লিগের নিবেশক সম্পাদক (recording secretary) ছিলেন পার্সনস।

এটাও লক্ষণীয়, পার্সনস নিজেকে একই সাথে নৈরাজ্যবাদী ও সমাজতন্ত্রী বলে আখ্যা দিতেন, দু'টো মতবাদের মধ্যে পার্থক্যটা তাঁর কাছে পরিষ্কার ছিল না। সেই যুগে আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনে নৈরাজ্যবাদী ঝোঁক বেশ কিছুটা প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির মধ্যেও এই ঝোঁকটি বর্তমান ছিল। নৈরাজ্যবাদীদের অলীক তত্ত্বগুলোকে খণ্ডন ক'রে মার্ক্স ও এঙ্গেলস যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন, তা তখনো আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর চেতনায় স্বচ্ছ হয়ে ওঠে নি।

—::—

সাংবাদিক স্যুইনটন

ঊনবিংশ শতকের আশী দশকে আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে যাঁর অবদান ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, তাঁর নাম জন স্যুইনটন (John Swinton)।

বিশ বছর বয়েস পার হবার আগেই তিনি একবার নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন দক্ষিণ ক্যারোলিনাতে নিগ্রো ক্রীতদাসদের লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে। ধরা পড়লে জেল খাটার সম্ভাবনাও ছিল পুরোদস্তুর। তাই কাজটা চলত রাতে এবং গোপন গুহায়।

১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন নিউ ইয়র্ক টাইমস (New York Times) পত্রিকার প্রধান সম্পাদকীয় লেখক এবং পরবর্তীকালে হয়েছিলেন ডানাস সান (Dana's Sun) পত্রিকার পরিচালক সম্পাদক। নিউ ইয়র্কের সাংবাদিক জগতে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল আসামান্য। সম্ভবত ১৮৮০ সালের এক রাতে ঐ পেশার মহারথীরা তাঁকে এক প্রীতি-ভোজে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আপ্যায়িত করেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের কোনো একজন স্বাধীন প্রেসের উদ্দেশে স্বাস্থ্যপান করতেই স্যুইনটন ক্ষিপ্ত স্বরে বলে উঠলেন :

"আমেরিকায় ছোট শহরে ছাড়া স্বাধীন প্রেস বলে কিছুই নেই। আপনারা তা জানেন আর আমিও জানি। আপনাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি তাঁর অকপট মতামত লেখার সাহস রাখেন এবং যদি তা রাখতেন, তাহলে আগে থেকেই জানতেন যে সেই লেখা ছেপে বেরুবে না কখনোই।···নিউ ইয়র্ক সাংবাদিকদের কাজই হল সত্যকে লোপ করা, ডাহা মিথ্যে কথা বলা, বিকৃত

করা, কুৎসা রটানো, অর্থ-পিশাচের পদতলে মূর্ছা যাওয়া এবং নিজের প্রাত্যহিক প্রাণধারণের জন্য তাঁর স্বজাতি ও স্বদেশকে বিক্রি করা। আপনারা এটা জানেন এবং আমিও জানি, অথচ 'স্বাধীন প্রেসে'র স্বাস্থ্যকামনায় এ কী নির্বুদ্ধিতা। পর্দার অন্তরালে যে সব বড়লোকেরা আছেন, তাঁদেরই হাতিয়ার ও বাহন হলাম আমরা। আমরা খেলার পুতুল, তাঁরা সুতো টানেন, আমরা নাচি। আমাদের সুদক্ষ নৈপুণ্য, আমাদের সম্ভাবনা ও আমাদের জীবন সবই অন্যদের সম্পত্তি। আমরা বুদ্ধিজীবী গণিকা।"

১৮৭৪ সালে নিউ ইয়র্কে টমকিন স্কোয়ারের জনসভায় বেকারদের উপর যে বর্বর পুলিসী আক্রমণ চলেছিল, তারই ফলে সুইনটন ঝুঁকলেন শ্রমিক আন্দোলনের দিকে। পরবর্তীকালে তিনি প্রায়ই ঐ আক্রমণের কথা তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করতেন, কেননা সারা আশী দশক ধরে এরকম আক্রমণ ও সন্ত্রাস ছিল একটা দৈনন্দিন স্বাভাবিক ঘটনা। মাঝে মাঝে এসব ঘটনায় এতই উত্তেজিত হয়ে উঠতেন যে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী দিয়ে পরিবেষ্টিত শ্রমিক সভায় মৃত্যুকে উপেক্ষা ক'রেই বক্তৃতা শুরু করতেন: "৮০০০ রাইফেল আর ১২০০ ডাণ্ডা আমার দিকে উদ্যত হয়ে আছে....."। টমকিন স্কোয়ারের সন্ত্রাসের উল্লেখ ক'রে একটি বক্তৃতায় তিনি বললেন:

"কিন্তু তখন রাত প্রায় দশটা, তারা চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিল শান্তভাবে মেয়রের প্রতীক্ষায়। এমন সময় এল দলে দলে পুলিস, স্কোয়ারে তারা সারিবদ্ধ হল আর হুঁশিয়ারি না দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল অসহায় নিরস্ত্র জনতার ওপর, হিংস্রভাবে চালালো ডাণ্ডা, এলোপাথাড়ি আঘাত করল মাথায়, আহত করল অনেককে, ত্রিশ-চল্লিশ জনকে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে পুরলো স্টেশন অট্টালিকায়, কলকাতার অন্ধকূপের মতোই। সম্পাদকীয় কাপুরুষেরা ও বুদ্ধিজীবী প্রহরীরা তাদের এইসব বলির প্রাণীদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার জাগিয়ে তুলেছিল এই ব'লে যে এরা হল আসন্ন ভূমিকম্পের

সহচর, কমিউনিস্ট। ভদ্র মহোদয়গণ, রহস্যাবৃত কথায় আপনারা আতঙ্কিত হবেন না এবং এককালে যেমন 'অ্যাবোলিশনিস্ট' (Abolitionist) আখ্যায় এক আতঙ্ক রোগের উদয় হ'ত, 'কমিউনিস্ট' নামটি যেন ঠিক সেরকম রোগকে চাগিয়ে না তোলে। যদি ধরেই নেওয়া হয় যে সম্পাদকেরা ও পুলিসেরা 'কমিউনিস্ট' বলতে যা বোঝায়, এইসব অভাগা লোকদের ধ্যান-ধারণা তাই, তাহলে কি কেউ মনে করেন যে শুধু কথার জালে তাদের হৃদয় থেকে তা মুছে যাবে বা ডাণ্ডা মারলেই তাদের মাথা থেকে তা উবে যাবে ?"

স্বাধীন প্রেসের স্বাস্থ্যপান সভায় তাঁর সেই তীব্র প্রতিক্রিয়ার কিছুদিন পরেই সুইনটন সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন আর শুরু করলেন নিজের নামেই একটা নতুন সাপ্তাহিক 'জন সুইনটনের কাগজ' (John Swinton's Paper)। তারপর থেকে চলল শ্রমিক আন্দোলনের সপক্ষে দীর্ঘ তথ্যভিত্তিক ক্ষুরধার প্রচারের পালা—পিংকার্টন ঠগেদের বিরুদ্ধে, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক (contract labour) নিয়োগের বিরুদ্ধে, রবার-প্রভুদের বিরুদ্ধে। শ্রমিকদের সংগঠন, তাদের বেতনের হার আর আট-ঘণ্টা আন্দোলনের অগ্রগতিকে তুলে ধরার জন্য তাঁর পত্রিকায় খোলা হল একটা নিয়মিত বিভাগ। শ্রমিক আন্দোলন পেল প্রচারের একটা বলিষ্ঠ মাধ্যম। সাংবাদিকতার সে এক নতুন মোড়, এক নতুন অধ্যায়, যা আজো ইতিহাসের পাতা থেকে সত্যকে উদ্ধার করতে সাহায্য করে।

—::—

সময় হয়েছে নিকট এখন....

১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফেডারেশন অব অর্গানাইজড ট্রেডস অ্যাণ্ড লেবার ইউনিয়নস অব দি ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাণ্ড কানাডা (Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada)। ১৮৮৬ সালে সেই ফেডারেশনের নতুন নাম হয় আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার (American Federation of Labor) আর তার গঠন-তন্ত্রের মুখবন্ধে বলা হয় :

> "দুনিয়ার জাতিগুলিতে সব দেশের অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে এক সংগ্রাম চলছে, পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে তা এমন এক সংগ্রাম যার তীব্রতা বছরে বছরে বৃদ্ধি পাবেই আর সকল জাতির লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে দেবে সর্বনাশা পরিণতি যদি তারা পারস্পরিক রক্ষাব্যবস্থা ও সুযোগসুবিধার জন্য সংঘবদ্ধ না হয়।"

১৮৮৪ সালের সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল যে ১৮৮৬ সালের ১লা মে তারিখে আট-ঘণ্টার দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমেরিকার সমস্ত শ্রমিকেরা যেন সমবেত হয়।

এদিকে নাইটস অব লেবার (Knights of Labor) নামে শ্রমিক সংগঠনটি হয়ে ওঠে প্রচণ্ড শক্তিশালী। ১৮৮০ সালে তার সভ্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২৮,০০০ আর সেটা ১৮৮৬ সালে হয়ে দাঁড়াল ' ,০০,০০০। তার মধ্যে শেষের বছরটায় অগ্রগতি ছিল অসামান্য। ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে সভ্য সংখ্যা এক লাখ থেকে সাত লাখে উঠে গেল। সেই সভ্যদের মধ্যে "আট-ঘণ্টার উন্মাদনা" ধারণ করল একটা বিরাট আকার।

যে সব জুতোর কারখানায় ইতিমধ্যেই আট-ঘণ্টা আদায় করা গেছে, সে সব জুতোর নাম হয়ে গেল "আট-ঘণ্টা জুতো"। "আট-ঘণ্টা জুতো" প'রে "আট-ঘণ্টা চুরুট" মুখে সর্বত্র শ্রমিকদের মিছিল আর স্লোগান। আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে তারা গান গেয়ে চলেছে :

"We mean to make things over
We're tired of toil for nought
But bare enough to live on ; never
An hour for thought.

We want to feel the suhshine : we
Want to smell the flowers
We're sure that God willed it
And we mean to have eight hours.

We're summoning our forces from
Shipyard, shop and mill
Eight hours for work, eight hours for rest
Eight hours for what we will !"

ভাবার্থ কতকটা এই রকম :

আমরা যে চাই পরিবর্তন,
অবসাদে জর্জর—
তবু তো জোটে না দু মুঠো অন্ন,
মননের অবসর।

রবির কিরণে, কুসুম-গন্ধে
ভ'রে নিতে চাই মনটা।
জানি, বিধাতারও তাই অভিলাষ,
চাই চাই আট ঘণ্টা।

কল-কারখানা-বন্দর থেকে
বাজাই যে রণডঙ্কা :
শ্রম, বিশ্রাম, আনন্দ—সবই
এক একটি আট-ঘণ্টা।

স্বভাবতই মালিকদের মনে দেখা দিল আতঙ্ক। খবরের কাগজেও শুরু হল এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কুৎসার বন্যা ও সুপটু প্রচার। ১৮৮৬ সালের ২৫শে এপ্রিল নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা এই আন্দোলনকে "অমার্কিন" আখ্যা দিয়ে লিখেছিল, "বিদেশীরাই এনেছে শ্রমিক অসন্তোষ ("labour disturbances are brought about by foreigners")। সেই সাথে চলল মালিক ও পুলিশের সশস্ত্র প্রস্তুতি। টেক্সাস থেকে সেণ্ট লুই পর্যন্ত রক্ত ঝরালো জাতীয় রক্ষীবাহিনী ও পিংকার্টনেরা; ফেডারেল কোর্টের ইনজাংশন অমান্য করার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হল ১৩০০ ধর্মঘটীকে। ৭ই এপ্রিল তারিখে মিসিসিপি নদীর পারে পূর্ব সেণ্ট লুইতে একদিকে ধর্মঘটীরা আর অন্যদিকে ডেপুটি শেরিফেরা, পুলিস ও সশস্ত্র বাহিনী লড়াই চালালো আর খুন হল সাতজন শ্রমিক। আট-ঘণ্টার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে।

কিন্তু নাইটস অব লেবারের সভাপতি টেরেন্স ভি. পাউডারলি (Terence V. Powderly) তা সইতে পারলেন না। সংগঠনের এত দ্রুত বৃদ্ধি ও তীব্রতা নাকি তাঁর স্বাস্থ্যকে ভেঙে চুরমার ক'রে দিচ্ছিল। তা ছাড়া, তাঁর মতে, ১৮৮৬ সালের ১লা মে তারিখে ধর্ম-

ঘটের সিদ্ধান্ত নিয়ে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী নাকি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল! তিনি ছিলেন এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে। তাঁর মতে, ধর্মঘট করাই অন্যায় ও নিস্ফল। হাতে-কড়া-পড়া খেটে-খাওয়া মানুষদের তিনি সন্দেহের চোখেই দেখতেন কেননা তারা নাকি অত্যধিক জঙ্গী। শ্রমিকদের উৎপাদক সমবায় সমিতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে পুঁজিবাদকে লোপ করার শিক্ষাদানই ছিল তাঁর কাছে প্রধান্ কাজ। ১লা মে তারিখে ধর্মঘট না ক'রে বরং ওয়াশিংটনের জন্মদিনে সারা দেশের শ্রমিকেরা যেন খবরের কাগজগুলিতে চিঠি লেখে—এই ছিল তাঁর প্রস্তাব। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে অবজ্ঞা ক'রে একের এক শাখা থেকে ১লা মে তারিখের ধর্মঘটকে সমর্থন ক'রে প্রস্তাব এল। এ এক অপ্রতিরোধ্য গতি! এমন এক অবস্থার মধ্যেই তিনি পদত্যাগ করতে চাইলেন কেননা "যে কাজ আমার কাছে আশা করা হয়, তা করার শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য আমার নেই" আর সভ্যরাও নাকি জনসমক্ষে তাঁকে এক খারাপ অবস্থায় ফেলেছিল। তা ছাড়া, গোল্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম রেলপথে মাইনে কাটার বিরুদ্ধে ও ইউনিয়ন স্বীকৃতির দাবিতে যে ধর্মঘট চলছিল, সে ধর্মঘটেও তাঁর সংগঠনের সভ্যরা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধেই কাজ করছিল। ১লা মে তারিখে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ক'রে ফেডারেশনও তাঁকে বিপদে ফেলেছে।

তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেন নি, বরং আট-ঘণ্টার আন্দোলনকে ভেঙে দেবার জন্যে পর্দার অন্তরালে কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। ১৮৮৬ সালের ১৩ই মার্চ তারিখে তিনি একটা গোপন সার্কুলার পাঠালেন এই মর্মে: "কেন্দ্রীয় অফিসের নির্দেশ পালন করছি এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে নাইটস অব লেবারের কোনো সংস্থাই ১লা মে তারিখে আট-ঘণ্টা ব্যবস্থার জন্য কোনো-মতেই ধর্মঘট করবে না, কেননা এমন কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি এবং হবেও না।"

কিন্তু তবু রোধ করা গেল না আন্দোলনের গতিবেগ। পথে

পথে অজস্র মশাল হাতে নিয়ে চলেছে শ্রমিকদের মিছিল আর মুখে তাদের গান :

"Toiling millions now are waking
See them marching on.
All the tyrants now are shaking
Ere their power's gone.

Storm the fort, ye Knights of Labor
Battle for your cause :
Equal rights for every neighbor
Down with tyrant laws."

ভাবার্থ করলে দাঁড়ায় :

খেটে খায় যারা
উঠছে জেগে,
চেয়ে দেখো তারা
চলছে বেগে।
অত্যাচারীর বুক দুরু দুরু,
আসন টলতে করেছে শুরু।

ভাঙো সে দুর্গ, হে বীর শ্রমিক,
লড়াইতে হাঁকো রণধ্বনি :
সকলে সমান পাবে অধিকার
দলিয়া দুঃশাসনের গ্লানি।

—::—

সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাস্রোত

১লা মে, ১৮৮৬ সাল। বসন্তের আমেজ কাটিয়ে প্রখর সূর্য উঠেছে শিকাগোর আকাশে। সেদিন ছিল শনিবার, স্বাভাবিক কাজের দিন। কিন্তু কলকারখানায় সব কাজ বন্ধ, চিমনির ধোঁয়ায় আকাশ আজ আচ্ছন্ন নয়। ধর্মঘট, অথচ ছুটির আমেজ। হাসি-ঠাট্টা-তামাসায় মশগুল গুচ্ছ গুচ্ছ শ্রমিকেরা সবচেয়ে সেরা সাজসজ্জা ক'রে ছেলে-মেয়ে-বৌ নিয়ে বেরিয়েছে পথে মিচিগান এভিন্যুর মিছিলে যোগদান করতে। বাড়ির সবাই বেরিয়েছে, "এমন কি বিড়ালটাও।"

তাদের অজ্ঞাতসারেই অলি-গলিতে আর বিশেষ বিশেষ বাড়ির ছাদে জড়ো হয়েছে পুলিস ও পিংকার্টন ঠাঙাড়ে বাহিনী "শান্তি ও শৃংখলা" রক্ষার অজুহাতে। আর তাদের পরামর্শ দেবার জন্য নাগরিক কমিটির সভ্যরা একটা কেন্দ্রীয় অফিসে ব'সে সারাদিন অধিবেশন চালিয়েছেন শিকগোকে আট-ঘণ্টা আন্দোলনের হাত থেকে বাঁচানোর আশায়।

অন্যদের মতো অ্যালবার্ট পার্সনসও বেরিয়েছেন বৌ লুসি ও দুই ছেলেমেয়েকে সাথে নিয়ে। বাবার হাত ধরে চলেছে সাত বছরের মেয়ে লুলু আর মায়ের হাত ধরেছে আট বছরের ছেলে অ্যালবার্ট। জনস্রোতের আনন্দে তারা মাতোয়ারা।

এমন সময় পার্সনসের সেরা বন্ধু অগাস্ট স্পাইজ একখানা 'শিকাগো মেল' পত্রিকা হাতে নিয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে ছুটে এলেন আর জানালেন, সারা দেশে তিন লাখ চল্লিশ হাজার শ্রমিক মিছিল করছে, এক লাখ নব্বই হাজার ধর্মঘট করেছে এবং শিকাগোতেই আশি হাজার বেরিয়েছে মিছিল করার জন্য—তারা এইখানেই জড়ো হচ্ছে। তারপর দেখালেন পত্রিকাটির সম্পাদকীয়ের একাংশ :

"এই শহরে দুটি ভয়ঙ্কর দুর্বৃত্ত অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে; অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টায় দুটি মিটমিটে কাপুরুষ। তাদের একজনের নাম পার্সনস; অন্যটির নাম স্পাইজ…।

আজ তাদের লক্ষ্য রাখুন। চোখে চোখে রাখুন। কোনো অশান্তি ঘটলেই তাদের ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করুন। কোনো অশান্তি ঘটলে তাদের নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন।"

এর আগেও খবরের কাগজগুলি দিনের পর দিন রটিয়েছে, ১লা মে প্রচণ্ড গণ্ডগোল হবে। শিকাগো ডেইলি নিউজের কর্তা মেলভিল ই. স্টোনের (Melville E. Stone) ভাষায়, "প্যারি কমিউন দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল অবাধে।"

সবকিছুকে উপেক্ষা ক'রে হাসিমুখে শুরু হল মিছিল, মনে হল যেন শেষ নেই তার। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার রোমাঞ্চিত মুখ আর দৃপ্ত পদক্ষেপ। সব মতের, সব পথের লোকেরা জড়ো হয়েছে মিছিলে—নাইটস অব লেবার ও আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের সদস্যরা, জার্মান, পোল, রুশ, আইরিশ, ইটালীয়, বোহেমীয়, নিগ্রো, ক্যাথলিক, প্রটেস্টাণ্ট, ইহুদি, অ্যানার্কিস্ট, প্রজাতন্ত্রী, কমিউনিস্ট, গণতন্ত্রী, সোশ্যালিস্ট ইত্যাদি—জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার প্রাচীর চূর্ণ ক'রে চলেছে খেটে-খাওয়া মানুষের বিশ্বজয়ী মিছিল।

মিছিল শেষ হল লেক ফ্রণ্টে গিয়ে। সেখানে নানা ভাষায় শুরু হল বক্তৃতা—ইংরেজি, বোহেমীয়, জার্মান ও পোলিশ। শ্রমিক শ্রেণীর অপরাজেয় মিলিত শক্তির কথা বললেন পার্সনস। জার্মান শ্রমিক পত্রিকার সম্পাদক স্পাইজ ছিলেন জার্মান ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই পারদর্শী এবং শ্রোতাদের অতি প্রিয় বক্তা। ঘনঘন করতালির মধ্যে তাঁর বক্তৃতা হল শেষ।

এইভাবেই কেটে গেল মে-দিবস। কোনো রক্তপাত নেই, 'প্যারি

কমিউনের পুনরাবৃত্তি'ও নেই। পুলিশকে ফিরে যেতে হল ব্যারাকে।

পরের দিন ২রা মে ছিল রবিবার, ছুটির দিন। পার্সনস চলে গেলেন সিনসিন্নাটিতে একটা সভায় বক্তৃতা দিতে।

সোমবার ৩রা মে ধর্মঘট আরো বিস্তার লাভ করল। শিকগোর হাজার হাজার খেটে-খাওয়া মানুষ সত্যিই অর্জন করল আট-ঘণ্টা কাজের দিন। তখনো নাগরিক কমিটি ঘোষণা ক'রে চলেছেন— একটা কিছু করা দরকার। এদিকে পুলিসের মনেও শান্তি নেই, এত তোড়জোড় ক'রেও ১লা মে তারিখে তারা হতাশ হয়েছিল। তাই তারা আশা মেটাল ম্যাককর্মিক হার্ভেস্টার ওয়ার্কস নামে এক কারখানায়। সেখানে শ্রমিকেরা প্রথমে মুখোমুখি হল দালালদের। চলল ডাণ্ডাবাজি। তারপর সহসা পুলিস শুরু করল গুলি করতে। শ্রমিকেরা ছুটে পালানোর সময় আহত হল দলে দলে আর তাদের মধ্যে ছ'জন খুন হল সেখানেই।

ঘটনাস্থলের অনতিদূরেই কাঠ-চেরাই শ্রমিকদের এক সভায় তখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন স্পাইজ। তিনি স্বচক্ষে দেখলেন পুলিসের সেই বীভৎস হত্যালীলা। সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ ক'রে পরের দিনই সন্ধ্যায় হে-মার্কেট স্কোয়ারে ডাকলেন প্রতিবাদ-সভা।

৪ঠা মে মঙ্গলবারে পার্সনস ফিরে এলেন শিকাগোতে—সারা দেশ জুড়ে আট-ঘণ্টার লড়াই আর বিজয়ের খবরে মন তাঁর ভরে আছে। দুপুরে খাবার সময়ে লুসি শুনলেন সে সব কাহিনী আর জানালেন হে-মার্কেটে জনসভার আয়োজনের কথা। নারী সেলাই-শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য সেদিনই একটা সভার আয়োজন করেছিলেন লুসি। উজ্জ্বল সম্ভাবনার আনন্দে পার্সনস স্থির ক'রে ফেললেন যে নারী শ্রমিকদের সভাতেই তিনি যাবেন, হে-মার্কেটে নয়। নারী শ্রমিক সংগঠনের পরিকল্পনা নিয়ে পরামর্শ করার জন্যে তখুনি লুসিকে নিয়ে পার্সনস চলে গেলেন শ্রমজীবী সমিতির কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করতে। সাথে অবশ্য বাচ্চা দুটো আর অ্যালার্ম-এর (Alarm)

কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করতে। সাথে অবশ্য বাচ্চা দুটো আর 'অ্যালার্ম'-এর (Alarm) সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী হোমস-ও (Mrs Holmes) ছিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত চলেছে সেই সলা-পরামর্শ। এমন সময় আবির্ভূত হল এক বার্তবহ : "হে-মার্কেটে এক বিরাট সভা হচ্ছে। স্পাইজই একমাত্র বক্তা। তিনি আপনাকে যেতে বলেছেন এবং ফিলডেন আপনাকেও।"

পার্সনস যখন তাঁর স্ত্রী ও দু'টি সন্তানকে নিয়ে সভাস্থলে পৌঁছুলেন, তখনো স্পাইজ বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। তাঁরা কেউ জানতেন না যে অদূরেই প্রচুর সশস্ত্র পুলিস ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে আছে। স্পাইজের অগোচরেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন শিকাগোর মেয়র কার্টার হ্যারিসন (Carter Harrison)।

বক্তৃতার মঞ্চটি ছিল একটি খালি চারপায়া বগি। আরেকটা খালি বগির উপর বৌকে ও বাচ্চাদের বসিয়ে রেখে পার্সনস এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। স্পাইজের বক্তৃতা শেষ হবার পরেই তুমুল করধ্বনির মধ্যে পার্সনস শুরু করে দিলেন : "আমি কাউকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি, যা ঘটছে তা'ই মন খুলে বলতে এসেছি।" কথাটি শুনেই শিকাগোর মেয়র সভা থেকে চলে গেলেন থানায় এবং জানালেন যে অশান্তির কোনো আশংকা নেই, পুলিস মোতায়েন রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।

পার্সনসের বক্তৃতা শেষ হল রাত দশটায়। তখন লেকের মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আসছে, দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে। জনতাও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। সভার শেষ বক্তা সাম ফিলডেন (Sam Fielden) উঠলেন মঞ্চে। ইতিমধ্যে বৌ ও বাচ্চাদের নিয়ে পার্সনস গিয়ে বসলেন পাশেই একটা ভোজনালয়ে। ফিলডেনের কণ্ঠস্বর তখনো ভেসে আসছে বাতাসে। এমন সময় সহসা শোনা গেল "পুলিস, পুলিস" বলে চিৎকার। ক্যাপটেন ওয়ার্ড এসে থামলেন বগিটির কাছে আর বিস্মিত ফিলডেনের দিকে তাকিয়ে

বললেন, "ইলিনয় রাজ্যের জনগণের নামে আমি অবিলম্বে ও শান্তিপূর্ণভাবে এই সভা বন্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছি।" "কিন্তু ক্যাপটেন, আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবেই আছি," বললেন হতবাক ফিলডেন। মুহূর্তের মধ্যেই বিকট আওয়াজে ফাটল একটা বোমা। রাতের অন্ধকারে শুরু হল পুলিসী তাণ্ডব। চারদিকে চলেছে পুলিসের গুলি আর উন্মত্ত ডাণ্ডাবাজি। অসংখ্য লোক হল আহত। কিন্তু পুলিসও রেহাই পেল না—একজন ঘটনাস্থলেই মারা গেল আর সাতজন হল মারাত্মকভাবে আহত।

ঘটনার গতি যে অন্য খাতে বইছে, তা আন্দাজ করতে দেরি হল না পার্সনসের, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চলে গেলেন শিকাগোর বাইরে—শান্ত উইস্‌কন্‌সিন গ্রামাঞ্চলের একটি পাহাড়ে।

পরের দিন সারা দেশের বড় বড় পত্রিকা সমস্বরে জেহাদ ঘোষণা করল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে—কুৎসা, ঘৃণা ও ক্রোধের বন্যা বয়ে গেল। শিকাগো ট্রিবিউন লিখলেন:

> "এটা সাধারণ ন্যায়বিচারের দাবি যে ইউরোপীয় আততায়ী অগাস্ট স্পাইজ, মাইকেল স্কোয়াব ও সামুয়েল ফিলডেনকে ধরতে হবে, বিচার করতে হবে এবং খুনের জন্য ফাঁসি দিতে হবে।···এটা সাধারণ ন্যায়বিচারের দাবি যে, এদেশে জন্ম নিয়ে দেশকে কলঙ্কিত করেছে যে আততায়ী, সেই এ. আর. পার্সনসকে বন্দী করতে হবে, বিচার করতে হবে এবং খুনের জন্য ফাঁসি দিতে হবে।"

আর. এইচ. বাফ (R. H. Baugh) 'স্পেক্টেটরে' লিখলেন, যদি অভাবনীয়ভাবে অপরাধীরা আইনের দণ্ড থেকে রেহাই পায়, তাহলেও তাদের মৃত্যু অবধারিত, জনতাই তাদের ফাঁসিতে ঝোলাবে। তিনি লিখলেন, "তিন দিনের জন্য সভ্যতাকে বিদায় দিয়ে একটি প্রহরী কমিটি (Vigilance Committee) নিজেদের হাতেই আইন তুলে নেবে এবং সামাজিক শৃংখলাকে ফিরিয়ে আনবে।"

শিকাগো রাজ্যের অ্যাটর্নি জুলিয়াস এস. গ্রিনেল (Julius S. Grinnell) বললেন, "আগে হানা দাও, তারপর খুঁজে দেখো আইন" ("Make the raids first and look up the law afterwards")।

গ্রেপ্তার করা হল সাতজনকে—অগাস্ট স্পাইজ, স্যাম ফিলডেন, মাইকেল স্কোয়াব, জর্জ এঙ্গেল, অ্যাডলফ ফিশার,লুই লিংগ ও অস্কার নীবে। তাঁদের মধ্যে স্পাইজ ও ফিলডেন ছিলেন ঘটনাস্থলে। অ্যালবার্ট পার্সনসকে পুলিস খুঁজে পায় নি।

শুরু হল বিচারের প্রহসন।

—::—

বিচারের প্রহসন

বিচার শুরু হল ২১শে জুন তারিখে বিচারক জোসেফ ই. গ্যারির কাছে। যাঁরা অসামীদের অপরাধী ব'লে আগেই ঘোষণা করেছেন, তাঁদের নিয়েই গঠিত হ'ল জুরি!

নিরপরাধ সঙ্গীদের বিরুদ্ধে একটা সাজানো মামলা তৈরি হচ্ছে জেনে অশান্ত হয়ে উঠলেন পার্সনস। ফিরে গেলে তাঁকেও ফাঁসি বরণ করতে হবে, তা তিনি জানতেন। তবু আত্মসমর্পণ করবেন বলেই স্থির করলেন এবং বিচারের প্রথম দিনেই সহসা আবির্ভূত হলেন আদালতে আর ঢুকেই বললেন, "হে মাননীয় বিচারক, আমি এসেছি আমার নিরপরাধ কমরেডদের সাথে বিচারের সম্মুখীন হতে।" একজন বন্ধুকেও তিনি বলেছিলেন, "আমি জানি, আমি কী করেছি। ওরা আমায় খুন করবে। কিন্তু আমার মতোই সমান নিরপরাধ হয়েও আমার কমরেডরা অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে, এই কথা জেনে আমার পক্ষে স্বাধীন থাকাটা ছিল অসহনীয়।"

একজন রিপোর্টার লিখলেন, "তাঁদের না আছে অনুতাপ, না আছে অনুশোচনা, আর তাঁদের বিকৃত মনে সমাজটাই দাঁড়িয়েছে আসামীর কাঠগোড়ায়, তাঁরা নয়।"

কাগজের খবরে প্রকাশ, একজন যুবতী প্রত্যেক আসামীকে আদালত-কক্ষে প্রবেশের সময় একটা ক'রে ফুলের তোড়া উপহার দিয়েছিল। ফিলডেন যখন আদালতে বলতে ওঠেন, তখন একজন অতি সাধারণ দর্শক রিপোর্টারকে রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, "আমি বছরের পর বছর তাঁর কাছাকাছি বাস করেছি এবং তাঁর চেয়ে ভাল প্রতিবেশী বা আরো সৎ কেউ কখনো বাস করেনি।" মৃত্যুকে উপেক্ষা করা ও

শ্রমিকশ্রেণীকে রক্ষা করার কাজে আসামীরা ছিলেন যেমন মর্যাদা-সম্পন্ন, তেমনি প্রভাবশালী—বিচারের দিনে এ কথা অস্বীকার করার মতো গোঁড়ামি কোন পত্রিকাই দেখাতে পারেনি। আদালতে যেদিন তাঁরা অভিযোক্তাদের অভিযুক্ত করলেন, সেদিন শুধু আদালত-কক্ষেরই নয়, সারা দেশের কর্তৃত্বই ছিল তাঁদের হাতে।

আদালতে নীবে ছিলেন প্রথম বক্তা। তাঁর অবশ্য মৃত্যুদণ্ড হয়নি, তিনি পেয়েছিলেন ১৫ বছরের কারাদণ্ড। আদালতে তাঁর বক্তব্যের ধারাটি ছিল এই রকম :

"আমি দেখেছিলাম এই শহরে রুটিওয়ালাদের প্রতি কুকুরের মতো ব্যবহার করা হত···আমি তাদের সংগঠিত হতে সাহায্য করেছিলাম। সেটা একটা বিরাট অপরাধ। চোদ্দ বা ষোল ঘণ্টার বদলে লোকেরা এখন দিনে দশ ঘণ্টা কাজ করছে ··সেটা আরেকটা অপরাধ। তার চেয়েও বড় অপরাধ আমি করেছি। সকালে আমার সাথীদের সাথে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখেছি, শিকাগো শহরের মদ চোলাইকারীরা ভোর চারটের সময় কাজে যেত। তারা বাড়ি ফিরত রাত সাতটা বা আটটায়। তারা দিনের আলোয় কখনো দেখেনি তাদের পরিবার বা শিশুদের···আমি তাদের সংগঠিত করতে গিয়েছিলাম···আর, হে মহানুভব, আমি আরেকটা অপরাধ করলাম। আমি মুদিখানার কর্মচারীদের ও এই শহরের অন্যান্য কর্মচারীদের সন্ধ্যার পরে দশটা-এগারোটা পর্যন্ত কাজ করতে দেখেছি। আমি একটা আহ্বান জানাই···আর আজ তারা সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত কাজ করে এবং রবিবারে কাজ বন্ধ। সেটা একটা বিরাট অপরাধ।"

যেহেতু তাঁর নিরপরাধ বন্ধুদের চেয়ে কোনমতেই তিনি অধিক নিরপরাধ নন, সেজন্য তাঁকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক—এই আবেদন রেখেই তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

তারপরেই বলতে উঠলেন পার্সনস, তাঁর কোটের কলারে ফুল

আর মুখে কবিতা। যে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বক্তব্য শুরু করলেন, তার ভাবার্থ কতকটা এই রকম :

"চূর্ণ কর দাসত্বের দৈন্য আর ভীতি ;
রুটিই তো স্বাধীনতা, স্বাধীনতা রুটি।"
("Break thy slavery's want and dread :
Bread is freedom, freedom bread.")

নির্ভীক ও আবেগ-ভরা কণ্ঠে দু'দিন ধরে বলে চললেন খেটে-খাওয়া মানুষের কাহিনী—ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে হিংসার আশ্রয় নেবার জন্য অজস্র খবরের কাগজের সম্পাদকীয় উস্কানি, পিংকার্টন ঠেঙাড়ে বাহিনী, পুলিস ও সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণ, বিনা প্ররোচনায় গুলি ও খুন ইত্যাদি। বললেন, মালিকদের শক্তি প্রয়োগের উত্তরে শক্তি প্রয়োগ ছাড়া তিনি কখনো হিংসার ওকালতি করেন নি। অভিযোগ করলেন, আমেরিকার জীবন থেকে আট-ঘণ্টার আন্দোলনকে মুছে ফেলার জন্যই শিল্পপতিরা ভাড়া করেছিল হে-মার্কেটের বোমা নিক্ষেপকারীকে। আরো বললেন :

"আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলন বলে যা পরিচিত, গত বিশ বছর ধরে আমার জীবন তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তাতে আমি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছি।…আমি একজন নৈরাজ্যবাদী।*

---

* পার্সনস-এর কাছে নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র ছিল সমার্থক অর্থাৎ পার্থক্যটা তাঁর কাছে তখনো পরিষ্কার ছিল না। রাষ্ট্রের আশু অবলুপ্তিই ছিল নৈরাজ্যবাদীদের দাবি। শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্য সমেত সমস্ত রকমের কর্তৃত্বের বিরোধী ছিলেন তাঁরা। ব্যক্তিতাবাদ, বিষয়ীভাব ও স্বেচ্ছাধীনতা হল নৈরাজ্যবাদের দার্শনিক ভিত্তি। নৈরাজ্যবাদের আবির্ভাবের সাথে প্রুধোঁ, বাকুনিন, ক্রোপোটকিন ইত্যাদির নাম জড়িত। নৈরাজ্যবাদীদের অলীক তত্ত্বগুলিকে খণ্ডন ক'রেই মার্কস ও এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটান।

এখন আঘাত করুন! কিন্তু আঘাত করার আগে আমার কথা শুনুন। সমাজতন্ত্র বা নৈরাজ্যবাদ কী? সংক্ষেপে, উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ব্যবহারে শ্রমজীবীর স্বাধীন ও সমান অধিকার এবং উৎপাদনের উপর উৎপাদকের অধিকার। সেটাই সমাজতন্ত্র।

আমি একজন সমাজতন্ত্রী। নিজে একজন মজুরি-দাস হলেও আমি তাঁদেরই একজন, যাঁরা নিজে প্রভু হয়ে, দাসদের মালিক হয়ে মজুরি-দাসত্বের হাত থেকে পালানোকে অন্যায় মনে করে, অন্যায় নিজের প্রতি, অন্যায় আমার প্রতিবেশীর প্রতি এবং অন্যায় আমার সহকর্মীদের প্রতি। আমি যদি জীবনে অন্য পথ নিতাম, তাহলে হয়তো আজ শিকাগো শহরে রাজপথের উপর সুন্দর ঘরে বিলাসে ও আয়াসে পরিবার-পরিবৃত হয়ে অপেক্ষারত দাসদের নিয়ে থাকতাম। কিন্তু আমি বেছে নিয়েছিলাম অন্য পথ এবং আমি আজ দাঁড়িয়েছি এখানে এই মঞ্চে। এটা আমার অপরাধ।

'ধর্মঘটীদের মধ্যে ডিনামাইট বোমা ছুঁড়ে অন্যদের সাবধান ক'রে দাও'—এ কথা কি তাঁরাই (একচেটিয়ারা) প্রথম বলেন নি? 'ওদের একটা রাইফেল খাবার দাও'—এ কথা কি প্রথম বলেন নি টম স্কট (পেনসিলভানিয়ার রাষ্ট্রপতি)? 'ওদের দাও বিষ'—এ কথা কি প্রথম বলেনি শিকাগো ট্রিবিউন? আর তারা তাই করেছে…তারাই ছুঁড়েছে বোমা এবং হে-মার্কেটে ৪ঠা মে তারিখের বোমাটি ছোঁড়া হয়েছিল নিউ ইয়র্ক শহর থেকে প্রেরিত একজন একচেটিয়া ষড়যন্ত্রকারীর হাত দিয়ে, আট-ঘণ্টা আন্দোলনকে চূর্ণ করার বিশেষ উদ্দেশ্যে…হে মহানুভব, সবচেয়ে নোংরা ও কালিমা-মাখা যে ষড়যন্ত্র কালের কাহিনীকে কলঙ্কিত করেছে, আমরা তারই বলি।"[৬]

ফিলডেন তাঁর ঘন দাঁড়ির ফাঁক দিয়ে বলে চললেন তিন ঘণ্টা ধরে ঃ

"আজ মনোহর বসন্তের সূর্য প্রতিটি মানুষের চিবুকে চুম্বন দিয়ে চলেছে সুবাসিত বাতাসে। তার কিরণে আমার মুখখানা আর ধৌত হবে না কখনো, তাই আমি এখানে দাঁড়িয়ে। আমি যেমন নিজেকে ভালবেসেছি, তেমনি ভালবেসেছি আমার সাথীদের। আমি ঘৃণা করেছি শঠতা, প্রবঞ্চনা ও অন্যায়কে। যদি কোন মঙ্গল সাধিত হয়, আমি অনায়াসেই সঁপে দিতে পারি নিজেকে।"[৭]

স্পাইজের ভাষণটিও ছিল অসাধারণ দৃপ্ত :

"অভাবে ও কষ্টে খেটে-খাওয়া লাখো লাখো নিষ্পেষিতেরা যে আন্দোলনে তাদের মুক্তির আশা দেখে, আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে আমাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে আপনারা সেই শ্রমিক আন্দোলনকে উচ্ছেদ করতে পারবেন—যদি এটাই আপনাদের মত হয়, তাহলে দিন আমাদের ফাঁসি! এখানে একটা স্ফুলিঙ্গের উপরে আপনারা পা দেবেন, কিন্তু সেখান থেকেই আপনাদের পেছনে, আপনাদের সামনে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে লেলিহান অগ্নিশিখা। এটা ভূগর্ভের আগুন। আপনারা তা নেভাতে পারেন না।...

আর এখন আমার ধ্যানধারণা হল এই। তা আমারই নিজস্ব অংগ। আমি তা ছাড়তে পারি না, পারলেও ছাড়তাম না। প্রতিদিনই যে সব ধ্যানধারণা আরো বেশি ক'রে বিস্তার লাভ করছে, তা আপনারা নির্মূল করতে পারেন বলে যদি ভেবে থাকেন, আমাদের ফাঁসিকাঠে পাঠিয়েই তা নির্মূল করা যাবে বলে যদি ভেবে থাকেন...সত্যি কথা বলার সাহস দেখানোর জন্য যদি আপনারা আরেকবারও মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চান...তাহলে গর্ব ও তাচ্ছিল্যের সাথেই আমি সেই মহার্ঘ মূল্য দেব! ডাকুন আপনাদের জল্লাদদের!...সক্রেটিস, খৃস্ট, গিয়র্দানো ব্রুনো, হাস, গ্যালিলিও-তে যে সত্যকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, তা এখনো জীবন্ত—তাঁরা এবং অন্যান্যদের একটা বিশাল বাহিনী এ পথে আমাদের পূর্বগামী। আমরা অনুগমনে প্রস্তুত।"

মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হল ১৮৮৬ সালে ৯ই অক্টোবর তারিখে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতার ভাষায়, বিচারক গ্যারির মুখখানা "কেঁপে উঠল সজোরে···আর 'ফাঁসি দেওয়া হল' কথাটি বলার সময় কণ্ঠস্বর আড়ষ্ট হয়ে এল এবং উচ্চারিত হল 'যতক্ষণ আপনার মৃত্যু না হয়'। শেষের কথাগুলো প্রায় শোনাই গেল না।"

লুসি কিন্তু তখনো হাল ছাড়লেন না। একদিকে যখন সুপ্রিম কোর্টে আপিলের ব্যর্থ চেষ্টা চলেছে, অন্যদিকে তখন লুসি দু'টি সন্তানকে সাথে নিয়ে সারা দেশ ঘুরে প্রায় এক বছর ধরে অক্লান্তভাবে চালিয়েছেন "সাতটি নিরপরাধ মানুষের জীবনকে, যার মধ্যে একজনকে আমি জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসি, সেই জীবনকে বাঁচানোর" অভিযান। ষোলটি রাজ্যে দু'লাখেরও বেশি মানুষের কাছে বক্তৃতা দিয়েছেন। দিনের বেলায় গাড়িতে, রাতে বক্তৃতা, সাথে তাঁর শিশুরা। টাকা তুলছেন, প্রতিবাদ সংগঠিত করছেন। কখনো অপমানিত হচ্ছেন, কখনো বা গ্রেপ্তার হচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে বা বাইরে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কাছে, বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে চিঠি লিখেছেন শতশত। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, লুসির এই সর্বাত্মক প্রয়াস ও নিষ্ঠার ফলেই যেটা প্রথম দিকে ছিল ব্যক্তিগত প্রতিবাদ, তা হয়ে উঠল বিশ্বব্যাপী লাখ লাখ মানুষের প্রতিবাদ।

কিন্তু তাতেও কিছু হল না। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি পুনরায় পরীক্ষা করতে অস্বীকার করলেন। তখন ১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখটি ফাঁসির দিন হিসেবে নির্ধারিত হল।

যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়াম ডিন হাওয়েলস, রবার্ট ইংগারসল, হেনরি ডেমারেস্ট লয়েড, জন ব্রাউন, শিকাগোর শত শত বিশিষ্ট নাগরিকেরা, সামুয়েল গম্পারস সহ বহু ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আর সারা দেশ জুড়ে হাজার হাজার মানুষ ঘোষণা করলেন যে রাজনৈতিক মতামতের জন্যই

তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের মৃত্যুদণ্ড মুকুব করার জন্যে আবেদন করলেন গভর্নরের কাছে।

ফ্রান্সের চেম্বার অব ডেপুটিজ থেকে গভর্নরের কাছে ক্ষমার আবেদন এল। ইটালি, ফ্রান্স, স্পেন, রাশিয়া, হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের প্রতিবাদ-সভা থেকেও এল একই আবেদন। ইংল্যাণ্ডের জর্জ বানার্ড শ ও উইলিয়াম মরিস এই ক'টি জীবনকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেন।

ফাঁসির মাত্র দু'দিন আগে গভর্নরের কাছে পড়ে দেওয়া হল স্পাইজ ও পার্সনসের দু'খানা চিঠি। স্পাইজ লিখলেন "বিচার চলার সময় আমাকে হত্যা করা ও তার চেয়ে লঘু শাস্তি দিয়ে আমাব সাথী অভিযুক্তদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য অভিযোগকারীর ইচ্ছা বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছিল। সে সময় আমার এবং আরো অনেকেরই মনে হয়েছিল যে একটা জীবন অর্থাৎ আমার জীবন নিয়েই অভিযোগকারী তৃপ্ত হবে···তাহলে এটাই নিন; আমার জীবনটাই নিন। যদি বৈধ খুন হতেই হবে, তবে একটাই, শুধু আমারটাই যথেষ্ট হোক।"

পার্সনস লিখলেন, "যদি আমি অপরাধী হই এবং হে-মার্কেট সভায় আমার উপস্থিতির জন্য ফাঁসিতে ঝুলতেই হয়, তাহলে আমি আশা করি, আমার স্ত্রী ও দুটি শিশু ঐ সভায় উপস্থিতির জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না দণ্ডিত হয় ও আমার সাথে ফাঁসিতে যায়, ততক্ষণ আমার বেলায় দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখা হবে।"

শুনে গভর্নরের মুখখানা পাংশু হয়ে হাতের তালুতে আশ্রয় নিয়েছিল। তবু কোনো ক্ষমা নেই।

কয়েকদিন আগেই পার্সনস তাঁর স্ত্রীকে লিখেছিলেন:

"আমার অসহায় প্রিয় বৌ···তোমাকে আমি জনগণের কাছেই অর্পণ করছি, জনগণের একজন নারী। তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ: আমি যখন রইবো না, তখন কোন বেপরোয়া কাজ কোরো

না, তবে সমাজতন্ত্রের মহান আদর্শকে আমি যেখানে রেখে যেতে বাধ্য হলাম, সেখান থেকে তাকে তুলে ধোরো।"

ফাঁসির আগের দিন ফিলডেন ও স্কোয়াবকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিয়ে গভর্নর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। ঐ দিনই মাত্র ২২ বছরেব যুবক লিংগ্ আত্মহত্যা করলেন অথবা খুন হলেন জেলের মধ্যে নিজের ঘরে!

স্পাইজ, ফিশার, এঞ্জেল ও পার্সনস সেদিন সারা রাত ঘুমোতে পারলেন না। পার্সনস গাইলেন কখনো সংগ্রামের গান, কখনো বা ভালবাসার গান!

পরের দিন শেষবারের মতো দেখার আশায় লুসি তাঁর ছুটি সন্তান নিয়ে ছুটে এলেন জেলের দরজায়। কিন্তু তাঁদের পুরে রাখা হল জেলেরই এক নিভৃত কক্ষে।

ফাঁসিকাঠে দাঁড়িয়ে সবাই ছিলেন নির্ভীক, দামাল, অপরাজেয়। শুধু ভেসে এল কয়েকটি কণ্ঠস্বর।

"আজ তোমরা আমাদের টুঁটি টিপে ধরছ, কিন্তু আমাদের নীরবতা সেই কণ্ঠস্বরের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এমন দিন আসবে"—স্পাইজের স্থির বিশ্বাস।

"এটা আমার জীবনে সবচেয়ে খুশির মুহূর্ত"—ফিশারের প্রত্যয়সিদ্ধ ঘোষণা।

"নৈরাজ্যের জয় হোক"—এঞ্জেলের উচ্ছ্বাস।

"হে আমেরিকার মানুষ, আমাকে বলার অনুমতি দেওয়া হবে কি? শেরিফ ম্যাটসন, আমাকে বলতে দিন! জনগণের কণ্ঠস্বর শোনা হোক!"—পার্সনসের আকুলতা।

শেষ হল চারটি জীবন, শুরু হল নতুন যুগের সূচনা।

—::—

মে দিবস ও মার্কস

"তিনি এমন একজন মানুষ যাঁর খ্যাতির লোভ নেই, জীবনের জাঁক-জমক বা ভানের প্রতি তাচ্ছিল্যে ভরা মন, তাড়াহুড়ো নেই আর বিশ্রামও নেই, কঠিন, উদার ও উন্নত মন, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, যুক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতি ও কার্যকরী লক্ষ্যে মগ্ন। যে সব বিস্ফোরণ জাতিগুলিকে আলোড়িত করেছে, সিংহাসনকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে, আজো যা রাজ-মুকুট ও প্রতিষ্ঠিত জালিয়াতিকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিচ্ছে, তার চেয়েও অনেক বড় ভূকম্পনের পেছনে ছিলেন এবং এখনো আছেন তিনি, ইউরোপের যে কোন অন্য লোকের তুলনায় বেশি, জোসেফ ম্যাজিনিকেও বাদ দিয়ে নয়। বার্লিনের ছাত্র, হেগেলবাদের সমালোচক, পত্রিকার সম্পাদক ও নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনের প্রাক্তন লেখক হিসেবে তিনি দেখিয়েছিলেন তাঁর গুণাবলী আর তেজস্বিতা; একদা ভীতিসঞ্চারকারী আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাতা ও মূল প্রবক্তা ও ক্যাপিটালের লেখক হিসেবে তিনি ইউরোপের অর্ধেক দেশ থেকেই হয়েছিলেন বিতাড়িত, সেই সব কটি দেশেই তাঁর লেখা ছিল নিষিদ্ধ এবং গত ত্রিশ বছর ধরে আশ্রয় নিয়েছেন লণ্ডনে।"

মার্কসের এই বর্ণনা লিখেছিলেন সেই যুগের আমেরিকার শ্রমজীবী মানুষের বিখ্যাত সাংবাদিক জন সুইনটন। ১৮৮০ সালে সুইনটন যখন ইউরোপে আসেন, তখন মার্কসের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়েছিল। তারপরেই লিখলেন ঐ বর্ণনা। মার্কসের বাচনভঙ্গী, সুইনটনের ভাষায়,

"...আমাকে মনে করিয়ে দেয় সক্রেটিসের কথা—এত অবাধ, এত দুর্বার, এত সৃজনশীল, এত অন্তর্ভেদী, এত অনাবিল—তার সাথে বক্রোক্তির ছোঁয়া, রসিকতার রশ্মি আর খেলার আনন্দ। তিনি বললেন ইউরোপের



"সব দেশের শ্রমজীবীরা এক হও।

শৃংখল ছাড়া হারানোর কিছুই নেই তোমাদের।"

কার্ল মার্কস : (৫ই মে, ১৮১৮—১৪ই মার্চ, ১৮৮৩)



"শ্রমিকশ্রেণীকে নিজেই নিজের মুক্তি আনতে হবে।"

ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস : (২৮শে নভেম্বর, ১৮২০—৫ই আগষ্ট, ১৮৯৫)

বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও জনপ্রিয় আন্দোলনের কথা—রুশ মেজাজের বিরাট স্রোত, জার্মান মনের গতিবেগ, ফ্রান্সের আন্দোলন, ইংল্যাণ্ডের স্থবিরতা—যে সব 'অণু-পরিমাণ' সংস্কার নিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্টের উদারপন্থীরা সময় কাটান, তা উল্লেখ করলেন ঘৃণাচ্ছলে। একটার পর একটা দেশ ধরে ইউরোপীয় জগৎকে সমীক্ষা ক'রে অন্তর্নিহিত ও অভিব্যক্ত বৈশিষ্ট্য, বিকাশ ও ব্যক্তিরূপকে নজরে এনে তিনি দেখালেন কীভাবে ঘটনাপ্রবাহ অনিবার্যভাবে লক্ষ্য সাধনের দিকে কাজ ক'রে চলেছে।"

১৮৪৮ সালের কমিউনিস্ট ইশতেহারের আহ্বান—"সব দেশের শ্রমজীবী মানুষ এক হও! শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর কিছুই নেই তোমাদের!"—আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনে ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। র‍্যামসগেটের সমুদ্র-সৈকতে একসাথে বেড়ানোর সময় স্যুইনটন মার্কসকে প্রশ্ন করেছিলেন, ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি কী ভাবছেন। "মনে হল, সামনের উত্তাল সমুদ্র আর সৈকতের অশান্ত জনতার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য তাঁর মনটা যেন অন্তর্মুখী হয়ে উঠল। গভীর ও প্রশান্ত স্বরে বেরিয়ে এল মার্কসের ছোট্ট উত্তর: 'সংগ্রাম'।"

১৮৮৬ সালের ১লা মে তারিখের অভ্যুত্থান মার্কস দেখে যেতে পারেননি। তার তিন বছর আগেই ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু আট-ঘণ্টা আন্দোলনের শুরু থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ আন্দোলনের প্রচার, ব্যাখ্যা ও সারা দুনিয়ায় ব্যাপ্ত করার কাজে তাঁর ছিল অদম্য প্রয়াস।

১৮৪৮ সালের কমিউনিস্ট ইশতেহারে "দুনিয়ার মজুর এক হও" —এই আহ্বান জানিয়েই মার্কস ও এঙ্গেলস ক্ষান্ত হননি। মানবমুক্তি বা বিশ্বমানবতার যত কথা বা তত্ত্ব যুগে যুগে নানা মনীষী ও দার্শনিকেরা বলে এসেছেন, তা ব্যর্থ হয়েছে বার বার। অলীক আকাশ-কুসুম

কল্পনার জাল বোনা নয়, তুনিয়াকে বদলানোই হল আসল কাজ। শ্রেণীসমাজের অবসান না ঘটিয়ে মানবসমাজের মুক্তি নেই, বিশ্ব-মানবতার স্থান নেই—এই কঠোর বাস্তব বৈজ্ঞানিক সত্যই জন্ম দিয়েছে ঐ আহ্বানকে। বিশ্ব-জোড়া খেটেখাওয়া শোষিত মানুষেরাই পারে বিশ্বমানবের জন্ম দিতে। তাই তাদের কাছেই ঐ আহ্বান।

শুধু তাই নয়। তাঁরা জানতেন, তুনিয়ার খেটেখাওয়া মানুষেরা ঐক্যবদ্ধ নয়। দেশ, ভাষা, জাতি, ধর্ম, ঐতিহ্য ইত্যাদির অজস্র বেড়াজাল থেকে শ্রমিককে মুক্ত না করতে পারলে সেই ঐক্য অনায়ত্ত থেকে যায়। কাজটা কঠিন, তাই অনলস প্রয়াসই ছিল তাঁদের পাথেয়।

এই প্রয়াসের ফলেই ১৮৬৪ সালে সৃষ্টি হল প্রথম আন্তর্জাতিকের। সংগঠনটির নাম "আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতি" (International Workingmen's Association)। এঙ্গেলসের ভাষায়, "তার লক্ষ্য ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার গোটা জঙ্গী শ্রমিক শ্রেণীকে একটি বিরাট বাহিনীতে সুসংহত করা"। শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক চরিত্রকে আন্তর্জাতিক সংগঠনে রূপ দেবার কাজে ব্রতী হলেন মার্কস-এঙ্গেলস। কেননা, আন্তর্জাতিক চরিত্র সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী প্রায়ই দেশ ও জাতীয় সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায়, এমন কি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের শিকার হয়, নেতৃত্ব ও পরিচালনার অভাব থাকলে আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সংহতির দিকে সে সচেতনভাবে চলতে পারে না। আন্তর্জাতিক সংগঠনই মেটাতে পারে সেই প্রয়োজন সফল-ভাবে। জাতীয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ শ্রেণী সংগ্রামকে দ্রুত আন্তর্জাতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত করার কাজে মার্কস-এঙ্গেলসের সজাগ সতর্ক দৃষ্টিই এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অত গৌরবময় ক'রে তুলেছিল।

১৮৬৪ সালেই প্রথম আন্তর্জাতিকে মার্কসের উদ্বোধনী ভাষণে কাজের ঘণ্টা কমানোর প্রসঙ্গে বক্তব্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

"অত্যন্ত প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের সাথে ত্রিশ বছরের সংগ্রামের পরে জমি-

প্রভু ও অর্থ-প্রভুদের মধ্যে একটা সাময়িক বিভেদকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী দশ ঘণ্টার আইন পাশ করাতে সফল হয়েছে। তার ফলে কারখানার কর্মীরা যে বিরাট শারীরিক, নৈতিক ও চিন্তাগত সুযোগ সুবিধা পেয়েছে, যা কারখানা পরিদর্শকদের অর্ধ-বার্ষিক রিপোর্টে স্থান পায়, তা এখন সর্বজনস্বীকৃত। অল্পবিস্তর সংশোধিত রূপে ইংরেজদের কারখানা আইন অধিকাংশ ইউরোপীয় সরকারকেই গ্রহণ করতে হয়েছে এবং ইংরেজদের পার্লামেণ্ট নিজেই প্রতিবছর তার কর্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু ব্যবহারিক দিকটি ছাড়াও মেহনতী মানুষের এই ব্যবস্থার অপূর্ব সাফল্যকে প্রশংসা করার আরো কিছু আছে। ডাঃ উরে, প্রফেসর সিনিয়র ও একই চরিত্রের অন্যান্য ঋষিপ্রবরদের মতো বিজ্ঞানের অত্যন্ত জঘন্য মুখপাত্রদের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল এবং প্রাণ ভরে প্রমাণ করেছিল যে, কাজের ঘণ্টার যে কোন বৈধ নিয়ন্ত্রণ শিল্পের মৃত্যু ঘোষণা করবে, যে শিল্প রক্তপিপাসুর মতো শুধু রক্তপান করেই টিকে থাকতে পারে এবং শিশুর রক্তও বটে। পুরাকালে শিশুহত্যা ছিল মোলোক ধর্মের এক রহস্যময় অনুষ্ঠান, কিন্তু সেটা পালন করা হত শুধু কয়েকটি ভাবগম্ভীর উপলক্ষ্যে, হয়তো বছরে একবার, এবং গরিবের শিশুদের প্রতিও মোলোকদের একমাত্র ঝোঁক ছিল না। কাজের ঘণ্টার বৈধ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সংগ্রাম অত্যন্ত হিংস্র আকার ধারণ করেছিল, কেননা আতঙ্কিত লোভ ছাড়াও এক বিরাট লড়াইকে তা প্রভাবিত করেছে—একদিকে যোগান ও চাহিদার নিয়মাবলীর অন্ধ শাসন, যা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক অর্থনীতি, আর অন্যদিকে সামাজিক দূরদর্শিতার নিয়ন্ত্রণে সামাজিক উৎপাদন, যা হল শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক অর্থনীতি। সুতরাং, দশ ঘণ্টার আইন শুধু একটা বিরাট ব্যবহারিক সাফল্যই নয়; এটা একটা নীতির জয়; এই প্রথম স্বচ্ছ দিবালোকে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক অর্থনীতির কাছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক অর্থনীতি নতি স্বীকার করল।"[৮]

১৮৬৬ সালের অগাস্ট মাসে বাল্টিমোরে আমেরিকার ন্যাশনাল

লেবার ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে বিখ্যাত আট-ঘণ্টার প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার কয়েকদিন পরেই মার্কস আন্তর্জাতিকের আসন্ন প্রথম কংগ্রেসের (জেনেভা) প্রতিনিধিদের উদ্দেশে লিখলেন :

"যে প্রাথমিক ব্যবস্থা ছাড়া ক্রমোন্নতি ও মুক্তির সকল নতুন প্রয়াসই ব্যর্থ হতে বাধ্য, তা হল কাজের দিনের সীমাবদ্ধতা।

প্রত্যেক জাতির একটা বিরাট অংশের অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর স্বাস্থ্য ও দৈহিক শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে এটা প্রয়োজন ; বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, সমাজমুখী আলাপ, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনাকে সুরক্ষিত করার জন্যও বটে।

আমরা প্রস্তাব করছি যে আট ঘণ্টার কাজই হবে কাজের দিনের বৈধ সীমা। এই সীমা সম্পর্কে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমজীবীদের সাধারণ দাবিকে সারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ কর্মসূচীতে উন্নীত করবে কংগ্রেসের সমর্থন।

কারখানা আইন সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা তুলনামূলকভাবে অল্প দিনের, সেই সব ইউরোপীর সদস্যদের অবগতির জন্য বলতে চাই যে আট ঘণ্টা কাজের জন্য দিনের অংশবিশেষ যদি স্থির না হয়, তাহলে সমস্ত বৈধ নিয়ন্ত্রণই ব্যর্থ হবে এবং তা পুঁজির হাতে চূর্ণ হবে। আট ঘণ্টার কাজ ও খাওয়ার জন্য বাড়তি বিরতি দিয়েই স্থির হবে ঐ সময়-সীমা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, খাওয়ার জন্য যদি বিভিন্ন বিরতি হয় এক ঘণ্টা, তাহলে দিনের বৈধ সীমা হওয়া উচিত নয় ঘণ্টা, ধরা যাক, সকাল সাতটা থেকে বিকেল চারটা, অথবা সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা, ইত্যাদি। আইনে নির্দিষ্ট ব্যবসাতে বা ব্যবসার শাখাগুলিতে রাত্রে কাজ চলতে পারে শুধু ব্যতিক্রম হিসেবে। রাত্রে সমস্ত কাজ বন্ধ রাখার ঝোঁকই রাখতে হবে।

সাবালক পুরুষ ও নারীর জন্যই এই অনুচ্ছেদের উল্লেখ। যাই হোক, যে কোন ধরনের নৈশ শ্রম এবং মেয়েদের কমনীয়তাকে আহত করে

বা তাদের দেহকে বিষাক্ত বা অন্য কোনো ক্ষতিকর পদার্থে জর্জরিত করতে পারে, এমন যে কোনো কাজ থেকেই মেয়েদের অব্যাহতি দিতে হবে। যারা ১৮ বছর বয়েসে পৌঁচেছে বা পার হয়েছে, সাবালক বলতে আমরা তাদেরই বুঝি।"[৯]

তার ঠিক পরের মাসেই অর্থাৎ ১৮৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়া হয়:

"কাজের দিনের বৈধ নিয়ন্ত্রণ একটি প্রাথমিক ব্যবস্থা, যা না হলে শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি ও মুক্তির অন্যান্য সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।... এই কংগ্রেস কাজের দিনের বৈধ সীমাকে আট ঘণ্টা করার প্রস্তাব করছে।" আরো বলা হয়, "যেহেতু এই নিয়ন্ত্রণ উত্তর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের সাধারণ দাবি, কংগ্রেস এই দাবিকে সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের সাধারণ কর্মসূচীতে রূপান্তরিত করছে।" (রেখাটি লেখকের।)

এত অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সাথেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতারা শ্রমিক আন্দোলনকে সাধারণ মৌলিক দাবির ভিত্তিতে দেশের সীমানার বাইরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতেন সুদক্ষ সচেতন পরিচালকের ভূমিকা নিয়ে।

জেনেভা কংগ্রেসের পরেই ৯ই অক্টোবর তারিখে মার্কস অত্যন্ত আনন্দের সাথে কুগেলম্যানকে লিখলেন:

"একই সময়ে বাল্টিমোরে অনুষ্ঠিত আমেরিকান শ্রমিক কংগ্রেস আমাকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সংগঠনই ছিল সেখানকার আওয়াজ এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য, জেনেভার জন্য আমি যে দাবিগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলাম, তার অধিকাংশই সেখানে উত্থাপিত হয়েছিল শ্রমিকদের সঠিক সহজাত প্রবৃত্তির ফলে।"[১০]

মার্কসের আগ্রহ ও উৎসাহ আরো প্রকাশ পেয়েছে ১৮৬৭ সালের

৩০শে এপ্রিল তারিখে নিউ ইয়র্কে এস. মেয়ারের কাছে লেখা চিঠিতে :

"আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে একটা শক্তি হয়ে উঠেছে। আমেরিকায় যতগুলি সম্ভব শাখা প্রতিষ্ঠা করুন। বছরে সভ্য প্রতি এক পেনি করে চাঁদা, কিন্তু প্রত্যেকটি কমিউন যা পারে তাই দেয়। এ বছরের কংগ্রেস ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে লুসেনে।

প্রত্যেক কমিউন একজন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। এ সব ব্যাপারে, আমেরিকায় আপনি নিজে কীভাবে কাটাচ্ছেন সেই বিষয়ে ও সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে আমাকে লিখবেন।"[১১]

১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হল মার্কসের ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড, তাতেও কিন্তু যথাযথ স্থান পেল ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের আট-ঘণ্টার আন্দোলন ও প্রস্তাব। এমন কি, ১৮৬৬ সালে নিউ ইয়র্ক রাজ্যে ডানকার্কের শ্রমজীবীরা যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, তাও প্রকাশ করলেন ঐ গ্রন্থে :

"আমরা ডানকার্কের শ্রমিকেরা ঘোষণা করছি যে, বর্তমান ব্যবস্থায় কাজের সময়ের যে দৈর্ঘ্য চালু আছে, তা অত্যন্ত বেশি এবং তা শ্রমিককে বিশ্রাম ও শিক্ষার সময় তো দেয়ই না, বরং দাসপ্রথার চেয়ে সামান্য ভাল হলেও দাসত্বের অবস্থাতেই তাকে নিমগ্ন রাখে। সেজন্যই আমরা স্থির করেছি যে কাজের দিনের পক্ষে আট ঘণ্টাই যথেষ্ট এবং আইনেও যথেষ্ট বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত; সেজন্যই শক্তিশালী হাতিয়ার প্রেসের কাছে আমরা সাহায্যের আহ্বান জানাচ্ছি,...এবং সেজন্যই যাঁরা আমাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করবেন, আমরা তাঁদের সবাইকে শ্রম-সংস্কার ও শ্রমিক-অধিকারের শত্রু বলেই গণ্য করব!"[১২]

শুধু তাই নয়। বর্ণ-বিদ্বেষের প্রাচীর যেন শ্রমিকদের শ্রেণী-

সংহতিতে ভাঙন ধরাতে না পারে, সেই উদ্বেগ নিয়েই মার্কস ক্যাপিটালে লিখলেন :

"আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্ব যতদিন পর্যন্ত সাধারণতন্ত্রের এক অংশকে পঙ্গু করে রেখেছিল, ততদিন যে কোনো ধরনের স্বাধীন শ্রমিক আন্দোলনই ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত। যেখানে কালো চামড়ার শ্রমিক বিশেষভাবে চিহ্নিত, সেখানে সাদা চামড়ার শ্রমিক নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। কিন্তু দাসত্বের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আবির্ভূত হয়েছিল এক নূতন তেজোদ্দীপ্ত জীবন। গৃহযুদ্ধের প্রথম ফলই হল আট-ঘণ্টা দিনের আন্দোলন—এমন এক আন্দোলন যা দুরন্ত গতিতে ছুটে চলল অতলান্তিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে, নিউ ইংল্যাণ্ড থেকে কালিফোর্নিয়ায়।"[১৩]

এদিকে ১৮৬৯ সালেই সহসা মারা গেলেন আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীর একজন অনন্য সংগঠক ও নেতা উইলিয়াম এইচ. সিলভিস। সিলভিসের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার পরেই আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের সদস্যদের কাছে পাঠানো হয় এক শোক-বার্তা। তা ছাড়া, বেল কংগ্রেসে মার্কসের লেখা সাধারণ পরিষদের যে রিপোর্টটি পেশ করা হয়, তাতে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর শেষ চিঠিখানা উদ্ধৃত করা হয়। ১৮৬৯ সালের ১৮ই অগাস্ট তারিখে এঙ্গেলসের কাছে মার্কস লিখলেন :

"প্রায় সারা বছর ধ'রে যুক্তরাষ্ট্র পরিক্রমা ক'রে যে শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রস্তুতিতে সর্বত্র প্রচার ক'রে বেড়িয়েছেন, সেই কংগ্রেসের ঠিক পূর্বে আমেরিকান লেবার ইউনিয়নের সভাপতি সিলভিস-এর (৪০ বছর) সহসা মৃত্যু বেদনাদায়ক। সুতরাং, তাঁর কর্মের একটা অংশ বৃথা হয়ে গেল।"[১৪]

তাঁর মৃত্যুর ফলেই ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নে শুরু হল বিপর্যয় এবং ক্রমে সেই ইউনিয়নের বিলুপ্তি ঘটল।

কিন্তু আট-ঘণ্টা আন্দোলন চলল অনিবার্য পরিণতির দিকে আর তারই ফলে সৃষ্টি হল ১৮৮৬ সালের মে-দিবসের অবিস্মরণীয় অভ্যুত্থান। যদিও তার তিন বছর আগেই মার্কস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, এঙ্গেলস (যাঁর নাম মার্কসের নামের সাথে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত) তখন বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর সামনে তুলে ধরলেন আন্তর্জাতিকতার পতাকাকে নিপুণ সতর্কতা ও একাগ্রতার সাথে। ঐতিহাসিক মে-দিবস ঘটনার একমাস পরেই (১৮৮৬ সালের ৩রা জুন) ফ্লোরেন্স কেলি-উইজনেৎস্কির কাছে এঙ্গেলস লিখলেন:

"আন্দোলনের নেতাদের এবং আংশিকভাবে নব-জাগ্রত জনগণেরও যে কোনো ভুল ও সংকীর্ণতাই থাকুক না কেন, একটা ব্যাপার নিশ্চিত: মার্কিন শ্রমিক শ্রেণী এগিয়ে চলছে এবং তাতে কোনো ভুল নেই। কয়েকটা ভ্রান্ত পদক্ষেপের পরে তারা শীঘ্রই ঠিক পথ ধরবে। দৃশ্যপটে মার্কিনদের এই আবির্ভাবকে আমি এ বছরের একটা অন্যতম বিরাট ঘটনা বলে মনে করি।

রুশ জারতন্ত্রের পতনের ফলে ইউরোপের বড় বড় সামরিক রাজতন্ত্র-গুলির পক্ষে যা হবে—অর্থাৎ আসল ঘাঁটিরই পতন—আমেরিকায় শ্রেণী সংগ্রাম ফেটে পড়ায় সারা দুনিয়ার বুর্জোয়াদের পক্ষেও তাই হবে। কেননা, যাই হোক, আমেরিকা ছিল সব বুর্জোয়াদেরই আদর্শ; এমন একটা দেশ যা সম্পদশালী, বিশাল, প্রসারমান, সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ বা রাজকীয় ঐতিহ্য থেকে মুক্ত বিশুদ্ধ বুর্জোয়া ব্যবস্থায় গড়া এবং যেখানে একটি স্থায়ী ও বংশগত সর্বহারা শ্রেণী নেই। পুঁজিপতি হতে না পারলেও এখানে প্রত্যেকে সব দিক থেকে একজন স্বাধীন লোক হিসেবে নিজের সামর্থ্য নিয়েই নিজস্ব হিসাব মতো উৎপাদন বা ব্যবসা করতে পারত। আর, যেহেতু তখনো পর্যন্ত বিপরীত স্বার্থের শ্রেণী ছিল না, আমাদের ও তোমাদের বুর্জোয়ারা ভাবত যে আমেরিকা শ্রেণী-বৈরিতা ও শ্রেণী-সংগ্রামের ঊর্ধ্বে। এই মোহ ভেঙে গেছে এখন, পৃথিবীতে শেষ বুর্জোয়া স্বর্গ দ্রুত নরকে পরিণত হচ্ছে এবং ইউরোপের মত নরক-কুণ্ডে পরিণত হওয়া থেকে তাকে বিরত করতে

পারে একমাত্র নব গঠিত সর্বহারা শ্রেণীর বিকাশের দ্রুত গতি। দৃশ্যপটে যে ভাবে তাদের আবির্ভাব ঘটেছে, তা সত্যই অসাধারণ: ছ'মাস আগেও কেউ কিছু আশঙ্কা করেনি, আর এখন সহসা তারা এমন সংগঠিত রূপে আবির্ভূত হয়েছে যে সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর মনেই আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। আমার একমাত্র ইচ্ছা, মার্কস যদি এটা দেখার জন্য বেঁচে থাকতেন!"[১৫]

মার্কস তখন বেঁচে নেই, তাই শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বকে শিক্ষিত ক'রে তোলার ভার এঙ্গেলস নিজেই নিলেন। তাত্ত্বিক স্বচ্ছতা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সচেতন নেতৃত্বের কাছে কাম্য হলেও সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর কাছে ভ্রান্ত পদক্ষেপের তিক্ত অভিজ্ঞতাই হল উপলব্ধির প্রশস্ত পথ। শ্রমিক শ্রেণীকে একটা শ্রেণী হিসাবে চালানো এবং সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া চরম বিজয়ের একটা অপরিহার্য শর্ত বটে, কিন্তু সেটা সহজসাধ্য নয়। তাই ধৈর্যের সাথে শ্রমিক শ্রেণীকে উপলব্ধির সময় ও সুযোগ দিতে হবে, উতলা হলে চলবে না। প্যারি কমিউনের প্রসঙ্গে এই প্রশ্নে মার্কস ১৭ই এপ্রিল, ১৮৭১ তারিখে কুগেলম্যানকে লিখেছিলেন: "পৃথিবীর ইতিহাস সত্যিই খুব সহজে সৃষ্টি করা যেত, যদি শুধু অভ্রান্তভাবে অনুকূল সুযোগের পরিবেশেই সংগ্রাম হত।" অসহিষ্ণু ধৈর্যহীন পেটি-বুর্জোয়া নেতৃত্বের চেতনায় এই বোধটি জাগানোর চেষ্টা করেছেন মার্কস বার বার। "এক ডজন কর্মসূচীর চেয়ে সত্যিকারের আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপ অনেক বেশি দামী"—মার্কসের এই উক্তিটিও সেই একই বোধশক্তির সহায়ক (৫ই মে, ১৮৭৫ তারিখে ব্রেকের কাছে লেখা চিঠি)। মে দিবসের ঘটনাবলীর পরেই এই চেতনা ও উপলব্ধির প্রতিফলন পাই এঙ্গেলসের চিঠিগুলিতে। ১৮৮৬ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর তারিখে আবার শ্রীমতী কেলি-উইজনেৎস্কির কাছে এঙ্গেলস লিখলেন এমন একখানা অনবদ্য চিঠি যার প্রতিটি ছত্র আজো আমাদের বোধশক্তিকে জাগ্রত করে।

সেই লম্বা চিঠিখানার কয়েকটা বিশেষ উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখযোগ্য :

"প্রথম থেকেই তত্ত্বগতভাবে একেবারে সঠিক পথে শুরু করা ও চলার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে, আন্দোলনের প্রসার হওয়া উচিত, সুসঙ্গতভাবে চলা উচিত, শিকড় গভীরে যাওয়া উচিত এবং যতখানি সম্ভব সমগ্র মার্কিন সর্বহারাকে জড়িয়ে ফেলা উচিত। নিজস্ব ভুলের মধ্য দিয়ে শেখার চেয়ে উপলব্ধির তাত্ত্বিক স্বচ্ছতার আর কোনো ভাল পথ নেই, 'তিক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা'। আর, একটা সমগ্র বিরাট শ্রেণীর পক্ষে, বিশেষ করে মার্কিনদের মতো এতো অনন্য কর্মদক্ষ এবং এতো তত্ত্ব-নিস্পৃহ জাতির পক্ষে এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। শ্রমিক শ্রেণীকে একটা শ্রেণী হিসেবে চালানোটাই বড় কথা; একবার তা অর্জিত হলে তারা অচিরেই ঠিক পথ খুঁজে পাবে এবং হেনরি জর্জ বা পাউডারলি'র মতো যারা বাধা দেবে, তারা নিজেদের ছোট গোষ্ঠী নিয়ে ঠাণ্ডায় জমে যাবে।...পুরোনো শিল্প প্রধান দেশগুলিতে উদ্ভূত তত্ত্বের পূর্ণ চেতনা নিয়ে আমেরিকা-বাসীরা শুরু করবে, এমন আশা অসম্ভবেরই আশা।...কিন্তু সর্বোপরি, আন্দোলনকে সংহত করার সময় দিতে হবে; যে সব ব্যাপার তারা বর্তমানে যথাযথভাবে বোঝে না কিন্তু শীঘ্রই শিখে নেবে, তা জোর ক'রে জনগণের গলায় ঢুকিয়ে দিয়ে প্রথম সূচনার অবশ্যম্ভাবী বিভ্রান্তিকে আরো হতবাক করে দিওনা।"[১৬]

১৮৮৮ সালের ডিসেম্বরে সেণ্ট লুই'র সম্মেলনে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার সিদ্ধান্ত নিল যে, ১৮৯০ সালের ১লা মে থেকে প্রতি বছর আমেরিকার শ্রমিকদের মিছিল-সমাবেশের দিবস হিসেবে পালিত হবে। তার কয়েকমাস পরেই ১৮৮৯ সালের ১৪ই জুলাই (বাস্তিল দুর্গের পতনের শতবার্ষিকী দিবসে) প্যারিসে জড়ো হলেন নানা দেশের সমাজতন্ত্রীরা নতুন ক'রে একটা আন্তর্জাতিক (দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। সেই প্যারিস কংগ্রেসই মে দিবসকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রস্তাবে বলা হয় :

"একটি নির্দিষ্ট দিনে সকল দেশে ও সকল শহরে খেটে খাওয়া মানুষেরা কাজের দিনকে আট ঘণ্টায় নামিয়ে আনার বৈধ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের কাছে যেন দাবি তোলে ও প্যারিস কংগ্রেসের অন্যান্য সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করে, সেজন্য কংগ্রেস একটা বিরাট আন্তর্জাতিক আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। যেহেতু ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বরে সেণ্ট লুইতে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের সম্মেলনে ১৮৯০ সালের ১লা মে তারিখটিকে একই ধরনের বিক্ষোভ মিছিলের দিন হিসেবে স্থির করা হয়েছে, এই দিনটিই আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ-মিছিলের দিবস হিসেবে গৃহীত হল। প্রত্যেক দেশের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের শ্রমিকেরা এই বিক্ষোভ-মিছিল অবশ্যই সংগঠিত করবে।" (রেখাটি লেখকের।)

তখন থেকেই শুরু হল আন্তর্জাতিক মে দিবস, শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম ও একমাত্র আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। আজ পর্যন্ত দেশ, জাতি, ভাষা, বর্ণ ইত্যাদির প্রাচীর অতিক্রম ক'রে দুনিয়ার শ্রমিকেরা এই দিবসটি পালন ক'রে চলেছে এবং দৃঢ় পদক্ষেপে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে চলেছে। ১৮৯০ সালের ১লা মে তারিখে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মে দিবসের প্রথম দিনেই কমিউনিস্ট ইশতেহারের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস লিখলেন :

"দুনিয়ার মজুর এক হও! বেয়াল্লিশ বছর আগে, প্রথম যে প্যারিস বিপ্লবে সর্বহারা তার নিজস্ব দাবি নিয়ে হাজির হয়, ঠিক তার পূর্বক্ষণে আমরা যখন পৃথিবীর সামনে এই কথা ঘোষণা করেছিলাম, সেদিন অতি অল্প কণ্ঠেই তার প্রতিধ্বনি উঠেছিল। ১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশের শ্রমিকেরা আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতিতে হাত মেলায়, এ সমিতির স্মৃতি অতি গৌরবজনক। সত্যি কথা, আন্তর্জাতিক বেঁচে ছিল মাত্র নয় বছর। কিন্তু সকল দেশের শ্রমিকদের যে চিরন্তন ঐক্য এতে সৃষ্টি হয়েছিল, সে ঐক্য

আজো জীবন্ত এবং আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী, বর্তমান কালটাই তার সর্বোত্তম সাক্ষ্য। কেননা, ঠিক আজকের দিনে যখন আমি এই পংক্তিগুলি লিখছি, তখন ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বহারা তাদের লড়বার শক্তি বিচার ক'রে দেখছে, এই সর্বপ্রথম তারা সংঘবদ্ধ, সংঘবদ্ধ একক বাহিনীরূপে, এক পতাকার নিচে, একটি উপস্থিত লক্ষ্য নিয়ে : ১৮৬৬ সালে আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে ও আবার ১৮৮৯ সালে প্যারিস শ্রমিক কংগ্রেসে যা ঘোষিত হয়েছিল, সেইভাবে আইন পাশ ক'রে সাধারণ আট ঘণ্টা শ্রমদিন চালু করতে হবে। আজকের দিনের দৃশ্য সকল দেশের পুঁজিপতি ও জমিদারদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে, আজ সকল দেশের শ্রমিকেরা সত্যই এক হয়েছে।

নিজের চোখে তা দেখার জন্য মার্কস যদি এখনো আমার পাশে থাকতেন!"

মার্কস তখন আর বেঁচে নেই। কিন্তু তখনো শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক বোধ ও সঠিক চেতনাকে আরো উন্নত করার কাজে এঙ্গেলস ছিলেন নিরলস। ১৮৯৩ সালে আন্তর্জাতিকেব জুরিখ কংগ্রেসে এঙ্গেলসের উপস্থিতিতেই প্রস্তাব নেওয়া হয় :

"শুধু আট ঘণ্টা দিনের জন্যই যে দিবসের সমাবেশ নয়, সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রেণী-বৈষম্যকে ধ্বংস করার জন্য তাকে অবশ্যই শ্রমিক শ্রেণীর দৃঢ় সঙ্কল্পের সমাবেশে পরিণত করতে হবে এবং এভাবেই যেতে হবে সেই পথে যেটা সকল জাতির শান্তির পথ, বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ।"

১৮৪৮ সালে যে রণধ্বনি, এঙ্গেলেসের ভাষায়, "অতি অল্প কণ্ঠেই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল", আজ তা কোটি কোটি কণ্ঠে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে তুলছে : দুনিয়ার মজুর এক হও!

—::—



"ক্ষমতা দখলের লড়াইতে সংগঠন ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর আর কোন অস্ত্র নেই।"

লেনিন : (২২শে এপ্রিল, ১৮৭০—২১শে জানুয়ারি, ১৯২৪)



১৮৯২ সালে এঙ্গেলস ও এলিনর মার্কসের উপস্থিতিতে লণ্ডনের হাইড পার্কে মে দিবস সমাবেশ।

সর্বহারার বিশ্বজয়ী অভিযান

এককালে মে দিবস ছিল বসন্তোৎসবের দিন। দুর্জয় শীতের শেষে তুষার গলতে শুরু করে, নতুন পাতা গজিয়ে ওঠে গাছে গাছে, দিগন্ত ছেয়ে ফেলে ফুলে ফুলে। বসন্তের আগমনে ১লা মে সারা ইউরোপই মেতে উঠত মে-রাণীর উৎসবে। মে-বৃক্ষ রোপন ক'রে কোনো এক তরুণীকে মে-রাণী সাজিয়ে মে-ফুলের সমারোহে চলত নাচ, গান, উৎসব। সেটাই ছিল মে দিবসের উৎসব।

আমেরিকায় ১৮৮৬ সালের অবিস্মরণীয় ঘটনাবলীর পরে মে দিবস দেখা দিল এক নতুন অর্থ, নতুন তাৎপর্য নিয়ে। মে দিবস আজ শ্রমিক শ্রেণীর দুনিয়া-জোড়া উৎসব, শোষণহীন সমাজ গড়ার শপথে মুখর, মিছিলে উত্তাল। আজকাল মে দিবস মানেই শ্রমিক দিবস। ঋতুর দিক দিয়ে ১লা মে কোথায়ও বসন্তকাল, কোথায়ও বা রুদ্র বৈশাখ। কিন্তু দুনিয়ার শ্রমিকের মনে তা এনে দেয় বসন্তেরই আমেজ। ১৯১২ সালের মে দিবসের ইশতেহারে স্তালিন তাই লিখেছিলেন ঃ

> "শীতের জড়তা কাটিয়ে প্রকৃতি যখন জেগে উঠছে, সবুজের ওড়নায় যখন সজ্জিত হচ্ছে অরণ্য-পর্বত, ফুলের বাহারে যখন শোভিত হচ্ছে মাঠ-প্রান্তর, সূর্যের কিরণ যখন আরো উষ্ণ হয়ে আসছে, আনন্দে আবার ভরে উঠেছে আকাশ-বাতাস আর প্রকৃতি নিজেই মেতেছে নাচে ও উৎসবে—সেই পয়লা মে তারিখেই শ্রমিকেরা সারা বিশ্বের কাছে মুক্ত কণ্ঠে ও প্রকাশ্যে ঘোষণা করবে, শ্রমিকেরাই আনছে মানবসমাজের বসন্ত, পুঁজিবাদের শৃংখল থেকে মুক্তি ; স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে পৃথিবীকে নতুন ক'রে গড়ে তোলাই শ্রমিকদের লক্ষ্য। ১৮৮৯ সালে দুনিয়ার সমাজতন্ত্রীদের প্যারি কংগ্রেস থেকেই শ্রমিকেরা এই সিদ্ধান্ত নেয়।"[১৭]

মে দিবস শ্রমিক শ্রেণীর মনে আনে মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মবিশ্বাস আর মালিক শ্রেণীর মনে দেয় অসীম আতঙ্ক। তাই মে দিবসের ঐতিহ্য ও তাৎপর্যকে ভুলিয়ে দেবার অপচেষ্টাও কম হয়নি। খোদ আমেরিকাতেই সেই চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে।

১৮৬৬ সালের ২০শে আগস্ট বাল্টিমোরে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে "শ্রমিককে পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে মুক্ত করার" প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, ১৮৯০ সালের ১লা মে নিউ ইয়র্কের ইউনিয়ন স্কোয়ারে প্রথম মে দিবস সমাবেশে ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাছে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার-এর প্রস্তাবে তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল আবারঃ "আট ঘণ্টা কাজের দিনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সময় আমরা কখনোই ভুলব না, আমাদের চরম লক্ষ্য হল (পুঁজিবাদী) মজুরি ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন।"

১৯১৭ সালেও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতিবাদে ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতি বোধে আমেরিকার মে দিবস মুখর হয়ে উঠেছিল। "১৯১৯ সালের মে দিবসে তখনকার সোশ্যালিস্ট পার্টির স্থানীয় সম্পাদক এবং পরের যুগে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক চার্লস ই. রুদেনবার্গ ক্লিভল্যাণ্ডে যে সমাবেশের আয়োজন করেন, তার চেহারা ছিল বিশেষভাবে সংগ্রামী। কুড়ি হাজারেরও বেশি শ্রমিক বিভিন্ন পথ পরিক্রমা ক'রে পাবলিক স্কোয়ারে জড়ো হন এবং সেখানে আরো কয়েক হাজার শ্রমিক তাঁদের সাথে যোগ দেন। পুলিস জানোয়ারের মতো সেই সভার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একজন শ্রমিককে খুন ও আরেকজনকে গুরুতরভাবে জখম করে।"[১৮]

কিন্তু খেটে-খাওয়া মানুষের মন থেকে মে দিবসকে মুছে ফেলতে না পারলে শোষক-শাসককুলের আর নিস্তার নেই। তাই রাষ্ট্রপতি হুভারের আমলে শুরু হল এক অভিনব পন্থা—১লা মে'কে ঘোষণা

করা হল শিশু স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে। অপচেষ্টা ও মতলবটা পরিষ্কার হয়ে গেল আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার-এর ১৯২৮ সালের সম্মেলনে কার্যকরী পরিষদের বিবরণী থেকে: "কমিউনিস্টরা এখনো ১লা মে'কে শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করে। যেহেতু কংগ্রেস থেকে এক প্রস্তাবে ১লা মে'কে শিশু স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালন করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা জারি করতে রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এখন থেকে ১লা মে পরিচিত হবে শিশু স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে। সারা বছর ধরে শিশু স্বাস্থ্য রক্ষার সপক্ষে মনোভাব তৈরি করাই হল লক্ষ্য। এটা অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্য। সেই সাথে এখন থেকে মে দিবস আর ধর্মঘট দিবস বা কমিউনিস্ট দিবস বলে পরিচিত হবে না।"[১০] এইভাবেই শ্রমিক শ্রেণীকে আত্মবিস্মৃত করার অপচেষ্টায় মদৎ দিয়েছিল সে যুগের আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার-এর নেতৃত্ব। এত চক্রান্ত সত্ত্বেও মে দিবস আপন মহিমায় আজো উজ্জ্বল, অব্যাহত ও সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত।

আমেরিকায় মে দিবসের যে শিখা জ্বলেছিল, তা শুধু সে দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, ছড়িয়ে পড়েছে দেশে-দেশান্তরে। সারা দুনিয়ায় মে দিবসের ব্যাপ্তির ইতিহাস বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে ভরা। শুধু কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখই হয়তো এখানে যথেষ্ট হবে।

গ্রেট বৃটেন

১৮৯০ সালের ১লা মে থেকে শুরু হয় প্রথম আন্তর্জাতিক মে দিবস অনুষ্ঠান। ১৮৯০ সালের ৪ঠা মে হাইড পার্কে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশের মধ্য দিয়েই গ্রেট বৃটেনে পালিত হয়েছিল প্রথম আন্তর্জাতিক মে দিবস। মার্কসের কন্যা এলেনর মার্কস ও তাঁর স্বামী এডওয়ার্ড এভেলিং-এর উদ্যোগেই এই সমাবেশ হয় এবং তাঁদেরই নেতৃত্বে গঠিত অদক্ষ শ্রমিকের ইউনিয়ন যোগ দিয়েছিল এই

সমাবেশে। তা ছাড়া, লণ্ডন ট্রেডস কাউন্সিল ও "ওল্ড" ইউনিয়নিস্টরাও এই সমাবেশে যোগ দেয় টম ম্যানের* উদ্যোগে ও নেতৃত্বে। এই প্রসঙ্গেই এঙ্গেলস লিখেছিলেন :

"প্রলেতারিয়েতের যে দিবস উৎসবটি শুধু জঙ্গী শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম আন্তর্জাতিক আন্দোলনের বিশ্বজনীন চরিত্রের জন্যই যুগান্তকারী ছিল না। বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত সন্তোষজনক অগ্রগতির স্মারক হিসেবেও তা কাজ করেছে। শত্রু-মিত্র সবাই একমত যে, সারা মহাদেশে অস্ট্রিয়ায় এবং অস্ট্রিয়াতে ভিয়েনায় প্রলেতারিয়েতের ছুটির উৎসবটি অত্যন্ত চমৎকার ভাবে ও মর্যাদার সাথে পালিত হয়েছে এবং তার ফলে অস্ট্রিয়ার, সর্বোপরি ভিয়েনার শ্রমিকেরা আন্দোলনে নিজেদের জন্য এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থান অর্জন করেছে। মাত্র তিন বছর আগেও যদি কেউ সজোরে বলত যে, ১৮৯০ সালের ১লা মে তারিখে ভিয়েনা ও সারা অস্ট্রিয়া সকলের কাছে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোৎসবের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, তাহলে তাকে হাস্যাস্পদ হতে হত। আজো যখন অন্যান্য দেশের শ্রমিকেরা, যেমন ফ্রান্সে, ঘরোয়া বিরোধের কলহে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করছে, সেটা বিবেচনা ক'রে এই ঘটনাটি না ভোলাই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। ভিয়েনা যা করেছে, তা প্যারিস পারে না— এ কথা কে জোর ক'রে বলতে পারে?

কিন্তু ৪ঠা মে তারিখে লণ্ডনের কাছে ভিয়েনা ম্লান হয়ে গেছে। ১৮৯০ সালের ৪ঠা মে ইংরেজ প্রলেতারিয়েত চল্লিশ বছরের ঘুমের জড়তা কাটিয়ে আবার নিজস্ব শ্রেণীর আন্দোলনে যোগ দিল—যে দিবসের সমগ্র উৎসবের মাঝে সেটাকেই আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চমৎকার বলে মনে করি।...

অগণিত বুর্জোয়া রাজনৈতিক দর্শকেরা যে অবাধ অনুভূতি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল, তা হল এই নিশ্চয়তা যে, পুরো চল্লিশ বছর ধরে বিরাট

* ১৯২০ সালে টম ম্যান ছিলেন গ্রেট বৃটেন কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

লিবারাল পার্টির লেজুড় আর ভোট-দেওয়া ভেড়ার পালের অবস্থা থেকে ইংরেজ প্রলেতারিয়েত অবশেষে নতুন, স্বাধীন জীবন ও কর্মের মাঝে জেগে উঠেছে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৯০ সালের ৪ঠা মে ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী মহান আন্তর্জাতিক ফৌজে যোগ দিল। এটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা। সবচেয়ে উন্নত শিল্প-বিকাশের মধ্যেই রয়েছে ইংরেজ প্রলেতারিয়েতের শিকড় আর তা ছাড়া, রাজনৈতিক আন্দোলনের সর্বাধিক স্বাধীনতাও তার আছে। একদিকে ১৮৩৬ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত চার্টিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতা আর অন্যদিকে ১৮৪৮ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত শিল্পের বিপুল বিকাশের ফলে যে দীর্ঘ ঘুমের জড়তা এসেছিল, তা অবশেষে ভাঙল। পুরোনো চার্টিস্টদের নাতিরা সবে রণাঙ্গনে প্রবেশ করছে। ইতিমধ্যেই আট বছর ধরে ব্যাপক জনতা আলোড়িত হচ্ছে কখনো এখানে, কখনো সেখানে। ছোট ছোট সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীও গজিয়ে উঠেছে, কিন্তু গোষ্ঠীর সীমানা অতিক্রম করতে পারেনি কেউ; শূন্যগর্ভ ভবিষ্যদ্বক্তা ও চটকদার সমেত আন্দোলনকারীরা ও তথাকথিত পার্টি নেতারা সেনা-বিহীন অফিসার হয়েই রয়েছে।···সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে ও এই অফিসারদের যোগ্য স্থান দেখিয়ে দিয়ে শক্তিশালী গণ-আন্দোলনই এই সব সম্প্রদায় ও ছোট ছোট গোষ্ঠীর অবসান ঘটাবে। যারা তা পছন্দ করে না, তারা মুখ লুকিয়ে পালাতে পারে। সংঘাত ছাড়া তা হবে না বটে, কিন্তু তা হবেই···"।[২০]

চীন

চীনে প্রথম মে দিবস পালিত হয়েছিল ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে ১৯২৪ সালে। চিয়াং-এর রাজত্বে অবশ্য তা বে-আইনী হয়েছিল। কিন্তু জনগণতান্ত্রিক চীনে মে দিবস জনগণের একটি বার্ষিক উৎসবের দিন।

জার্মানি

আন্তর্জাতিক মে দিবস পালনের প্রথম বছর থেকেই জার্মানিতে এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। হিটলারের ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়ের সময় মে দিবসের বিক্ষোভ-সমাবেশের উপর শুরু হল জঘন্য সশস্ত্র আক্রমণ। প্রতিবারেই সেই আক্রমণের মোকাবিলা করেছে জার্মান শ্রমিক শ্রেণী।

অবশেষে ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবার্গ হিটলারকে চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত করলেন। তার পরের মাসে অর্থাৎ ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে জার্মানির আইন সভা রাইখস্ট্যাগে আগুন লাগিয়ে শুরু হল মানবতার জঘন্য শত্রু ফ্যাসিবাদের পাশবিক অভিযান। শ্রমজীবী মানুষের সংগঠন ও তার নেতৃত্বকে সমূলে উৎখাত করার নৃশংস ফ্যাসিবাদী প্রয়াসকে আরো তীব্র করে তোলা হল। হাজার হাজার শ্রমিক নেতাকে পাঠানো হল বন্দী নিবাসে আর চলল অকথ্য দৈহিক নির্যাতন। কিন্তু তাতেও শ্রমিক আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করা গেল না।

তখন এক অভূতপূর্ব শঠতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল হিটলারকে। ১৯৩৩ সালের মে দিবসকে জাতীয় ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হল—সরকারীভাবে তার নামকরণ হল 'জাতীয় শ্রম দিবস'। বিপুল জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে উৎসবের আয়োজন হল যাতে জার্মানিতে সর্বকালের বৃহত্তম শ্রমিক সমাবেশে তা পরিণত হতে পারে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শ্রমিক নেতারা ছুটে এলেন বার্লিনে। ফ্যাসিস্টদের অত্যাচারে যে সব ইউনিয়নের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তা আবার খুলল। হাজার হাজার পতাকায় শোভিত হল বার্লিন। গোয়েবল্‌স্ ছিলেন এই ঐতিহাসিক সমাবেশের প্রধান সংগঠক। ঐ সমাবেশে হিটলার নিজে উপস্থিত থেকে শ্রমিক প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানালেন। তার বিপ্লব জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত—

এই কথা যে কতখানি অসত্য ও অসঙ্গত, সেটা সগর্বে ঘোষণা করেন হিটলার। পরে বিমান বন্দরে এক লাখ শ্রমিকের সামনে হিটলার বললেন, 'শ্রমকে সম্মান কর, শ্রমিককে শ্রদ্ধা জানাও' এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে জার্মান শ্রমিকের সম্মানে 'শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' মে দিবস পালিত হবে। বলা বাহুল্য, এই কপট প্রতিশ্রুতি কোনোদিনই পালিত হয়নি।

পরের দিনই এই ফ্যাসিস্টদের ষড়যন্ত্রের আসল চেহারাটা ধরা পড়ল। ২রা মে তারিখেই সারা দেশ জুড়ে শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে পাঠানো হল বন্দীশিবিরে; ট্রেড ইউনিয়ন অফিসগুলি দখল ক'রে নেওয়া হল; ইউনিয়ন তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হল আর ইউনিয়নগুলিকে ভেঙে দেওয়া হল।[২১]

এ সব সত্ত্বেও ফ্যাসিস্টদের পক্ষে শ্রমিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে গোপন অবস্থার মধ্যেই পালিত হয়েছে মে দিবস এবং নানা অভাবনীয় পদ্ধতিতে সারা দেশ জুড়ে ছড়ানো হয়েছে মে দিবসের ইশতেহার।

আরেকটি ঘটনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৫ সালের ১লা মে বিজয়ী সোভিয়েত লালফৌজ বার্লিনে প্রবেশ করে ও ফ্যাসিবাদের কবর রচিত হয়।[২২] সেদিনকার মে দিবস ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ের এক মহান উৎসব।

রাশিয়া

রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে মে দিবস হয়ে উঠেছিল শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের এক বিরাট হাতিয়ার। মে দিবসের ধর্মঘট, মিছিল, ইশতেহার সব কিছুই বৈপ্লবিক চেতনা ও সংগঠনের বিকাশের জন্য নিপুণ দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করেছিলেন লেনিন।

১৮৯৬ সালে জেলে আটক অবস্থাতেই লেনিন রচনা করেছিলেন

মে দিবসের ইশতেহার। এক মাস পরে বিখ্যাত সুতাকল ধর্মঘটে "ছোট্ট সাধাসিধে সেই ইশতেহারখানাই প্রথম তাঁদের প্রেরণা যুগিয়েছিল।"[২৩]

লেনিনের নেতৃত্বে যথেষ্ট প্রস্তুতি ক'রেই মে দিবস পালিত হত: এমন কি, ছ' মাস আগে থেকেই চলত সেই প্রস্তুতি। ১৯০০ সালের নভেম্বরে 'খারকভে মে দিবস' নামক পুস্তিকার ভূমিকায় লেনিন লিখলেন:

> "আর ছ' মাসের মধ্যেই রুশ শ্রমিকেরা নতুন শতাব্দীর প্রথম বছরের পয়লা মে পালন করবে। যত বেশি কেন্দ্রে সম্ভব ও যত বেশি চিত্তাকর্ষক উপায়ে সম্ভব এই উৎসবকে সংগঠিত করার জন্য আমাদের কাজ শুরু ক'রে দেওয়ার সময় হয়ে গেছে। চিত্তাকর্ষক শুধু অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যায় নয়, চিত্তাকর্ষক হবে অংশগ্রহণকারীদের সংগঠিত চরিত্র ও শ্রেণীচেতনার প্রকাশে, রুশ জনগণের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য এবং তার ফলে, শ্রমিক শ্রেণীর অবাধ বিকাশের সুযোগের জন্য ও সমাজতন্ত্রের সপক্ষে প্রকাশ্য সংগ্রামের জন্য লড়াইয়ের দৃঢ় সংকল্পে।"[২৪]
>
> "যাই হোক, দিনে আট ঘণ্টা কাজের দাবি সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর দাবি। ব্যক্তিগত মালিকের কাছে নয়, আজকের দিনের সমগ্র সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে, সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর কাছে, সমস্ত উৎপাদনের উপায়ের মালিকদের কাছে তা পেশ করা হয়েছে। আট ঘণ্টার দাবি লাভ করেছে বিশেষ তাৎপর্য। এটা হল আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে সংহতির ঘোষণা।"[২৫]

সেই ১৯০১ সালে স্তালিনের একেবারে প্রথম দিকের রচনাতেই পাই রাশিয়াতে মে দিবসের জয়যাত্রার কথা:

> "রাশিয়াতে পয়লা মে'র উৎসবগুলো রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ-মিছিলের পথকে প্রস্তুত করেছিল। আর, অতীতে যে ধর্মঘট ছিল সংগ্রামের একমাত্র অস্ত্র, তার সাথে রুশ শ্রমিকেরা যুক্ত করল একটা নতুন ও শক্তিশালী অস্ত্র—রাজনৈতিক বিক্ষোভ-মিছিল—যার

প্রথম পরীক্ষা হল ১৯০০ সালে খারকভের বিশাল মে দিবস সমাবেশের মধ্য দিয়ে।"[২৬]

১৯০৩ সালে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন নিজের হাতে লিখলেন মে দিবস সম্পর্কে খসড়া প্রস্তাবটি।[২৭]

১৯০৪ সালের এপ্রিলে 'মে দিবস' নামে এক ইশতেহারে অত্যন্ত সহজ সরল মর্মস্পর্শী ভঙ্গীতে অগণিত খেটে-খাওয়া বঞ্চিত মানুষের কাছে আহ্বান জানালেন লেনিন ঃ

"কমরেড শ্রমিকেরা! মে দিবস আসছে—সকল দেশের শ্রমিকেরা শ্রেণী-সচেতন জীবনে উত্তরণকে, মানুষের দ্বারা মানুষের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামী সংহতিকে, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অপমানের হাত থেকে কোটি কোটি খেটে-খাওয়া মানুষের মুক্তিসংগ্রামকে লক্ষ্য ক'রে এই দিনটি পালন করে। এই বিরাট সংগ্রামে মুখোমুখি দাঁড়ায় দুটি দুনিয়া : পুঁজির দুনিয়া আর শ্রমের দুনিয়া, শোষণ ও দাসত্বের দুনিয়া আর ভ্রাতৃত্ব ও মুক্তির দুনিয়া।

একদিকে রয়েছে মুষ্টিমেয় বিত্তবান রক্তপায়ীরা। তারা দখল করেছে কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি ও মেশিন, তারা কোটি কোটি একর জমি ও টাকার পাহাড়কে পরিণত করেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। তারা সরকার ও সেনাবাহিনীকে করেছে তাদের ভৃত্য, তাদের পুঞ্জীকৃত সম্পদের বিশ্বস্ত প্রহরী কুকুর।

অন্যদিকে রয়েছে কোটি কোটি বিত্তহীন। তারা ধনীদের কাছে কাজ করার অনুমতি পাবার জন্য ভিক্ষা চাইতে বাধ্য হয়। তারা নিজেদের শ্রম দিয়েই সৃষ্টি করে সমস্ত সম্পদ; তবু এক টুকরো রুটির জন্য তাদের আজীবন লড়তে হয়, দয়া-দাক্ষিণ্যের মতোই কাজের ভিক্ষা চাইতে হয়, হাড়-ভাঙা খাটুনিতে প্রাণশক্তি ও স্বাস্থ্যকে নিঃশেষ ক'রে দিতে হয় এবং গ্রামাঞ্চলে কুঁড়ে ঘরে অথবা বড় বড় শহরে অট্টালিকার ভূ-গহ্বরে ও চিলেকোঠায় অনাহারে থাকতে হয়।

কিন্তু এখন এই সব বিত্তহীন শ্রমজীবীরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ধনী ও শোষকদের বিরুদ্ধে। মজুরি দাসত্ব থেকে, দারিদ্র্য ও দৈন্য থেকে মুক্তির জন্য লড়ছে সকল দেশের শ্রমিকেরা। তারা এমন এক সমাজ ব্যবস্থার জন্য লড়ছে, যেখানে সকলের সাধারণ শ্রমে সৃষ্ট সম্পদ মুষ্টিমেয় ধনীদের জন্য নয়, সমস্ত শ্রমজীবী মানুষেরই কল্যাণে নিয়োজিত হবে। জমি, কলকারখানা ও মেশিনকে তারা সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করতে চায়। তারা ধনী ও দরিদ্রের বিভাগকে অবসান করতে চায়, নিজেদের শ্রমের ফল যেন শ্রমজীবীদের হাতেই যায় এবং মানব-মনের সকল অবদান, কর্মপদ্ধতির সকল উৎকর্ষ যেন শ্রমজীবীর জীবনকে উন্নত ক'রে তোলে এবং তা যেন নির্যাতনের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত না হয়।"[২৮]

এই ভাবে মূল নীতির ব্যাখ্যা ক'রে ও রাশিয়ার বাস্তব অবস্থার বর্ণনা দিয়ে রুশ শ্রমিককে তার যোগ্য ভূমিকা পালনের আহ্বান জানালেন লেনিন।

এর পর এল সেই ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারি তারিখে হাজার হাজার শ্রমিকের রক্ত-মাখা "রক্তাক্ত রবিবার"। শুরু হল প্রথম রুশ বিপ্লব। সেই কাহিনী বর্ণনা ক'রে বিপ্লবে আহ্বান জানিয়ে ১৯০৫ সালের এপ্রিলে লেনিন আবার লিখলেন 'পয়লা মে' নামে এক বিখ্যাত ইশতেহার।[২৯]

১৯১২ সালে লেনা স্বর্ণখনিতে আবার ঝরল শ্রমিকের তাজা রক্ত। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল প্রতিবাদ ও ধর্মঘট। ১৯১৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল তার প্রথম বার্ষিকী পালিত হল ব্যাপকভাবে শ্রমিকদের জঙ্গী সমাবেশের মধ্য দিয়ে। ১লা মে'র ধর্মঘটে যোগ দিলেন সেণ্ট পিটার্সবার্গের আড়াই লাখ শ্রমিক। এই সমগ্র কর্মকাণ্ডকে বিশ্লেষণ ক'রে লেনিন রুশ বিপ্লবের অনিবার্য গতিবেগকে দেখালেন তাঁর 'বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর মে দিবস সংগ্রাম' প্রবন্ধে।[৩০]

সেই সংগ্রামই অনিবার্য পরিণতি লাভ করল ১৯১৭ সালের দুনিয়া-

কাঁপানো নভেম্বর বিপ্লবে। সে বছর ১লা মে প্রাভদায় প্রকাশিত হল স্তালিনের লেখা 'মে দিবস'। অটল আত্মপ্রত্যয়ের সাথে তাতে বলা হল ঃ

"যে প্রাচীর শ্রমিকের মধ্যে বিভেদ আনে, তাতে ফাটল ধরাতে বাধ্য করার কাজে রুশ বিপ্লবই প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এই সর্বব্যাপী 'দেশপ্রেমিক' উন্মাদনার সময় রুশ শ্রমিকেরাই সেই বিস্মৃত স্লোগানকে প্রথম ঘোষণা করছে : 'সকল দেশের শ্রমিক এক হও !'৩১

সকল দেশের শ্রমিককে এক করার সংগঠনটিও গড়েছিলেন লেনিন নিজের হাতে। আর সেই তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক দেশে দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে শ্রমিক সংহতির কথা, সংগ্রামের কথা, বিপ্লবের কথা। প্রতি বছর মে দিবসে সারা দুনিয়ার শ্রমিকের কাছে আহ্বান জানিয়েছে সেই আন্তর্জাতিক, দেশে দেশে সংগঠিত হয়েছে মে দিবসের জঙ্গী সমাবেশ। তাই আজ সারা বিশ্বেই মে দিবস খেটে-খাওয়া মানুষের কাছে এত পরিচিত, এত প্রিয়, শ্রমিক আন্দোলনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ভিয়েৎনাম

তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গঠনের পরেই ১৯২০ সালে নব গঠিত ফরাসী কনিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন ভিয়েৎনামের প্রথম কমিউনিস্ট হো চি মিন এবং সেখানে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে সজোরে তুলে ধরলেন ভিয়েৎনাম সহ সমস্ত উপনিবেশের মুক্তি ও আন্তর্জাতিক সংহতির প্রশ্ন। পরবর্তীকালে ১৯৩০ সালে গঠিত হল ইন্দোচাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি এবং সেটাই ভিয়েৎনাম ওয়ার্কার্স পার্টিতে রূপান্তরিত হল ১৯৫১ সালে। হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎনামের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সারা বিশ্বেই আলোড়ন ও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে কেননা প্রায় ৪৫ বছর ধরে ফরাসী, জাপানী ও মার্কিনদের মতো তিন তিনটি প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদীদের

প্রত্যক্ষভাবে মোকাবিলা ক'রে ও সম্মুখ সমরে পরাস্ত ক'রেই ভিয়েৎ-নামের মুক্তি সম্ভব হয়েছে। এমনি এক সর্বগ্রাসী সংগ্রাম চলার সময় ১৯৬৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে হো চি মিন মারা গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে ভিয়েৎনামের বীর জনগণ বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করে চললেন এবং তারই ফলে এল ভিয়েৎনামের পূর্ণ মুক্তি।

হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎনামের জনগণের কাছে মে দিবস যে কতো প্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ পাই মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে। পয়লা মে'র পূর্বেই যাতে ভিয়েৎনামকে মুক্ত করা যায়, সেজন্য জাতীয় গণমুক্তি বাহিনী এগিয়ে চলেছিল দুর্বার গতিতে। অবশেষে ১৯৭৫ সালের ৩০ শে এপ্রিল তারিখেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের তাঁবেদার সরকার মুক্তি বাহিনীর কাছে করল নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। মার্কিনী যুদ্ধবাজেরা সদলবলে পালাল ভিয়েৎনাম থেকে। দীর্ঘ কুড়ি বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষ হল সায়গনের পতনে। তখন সায়গনের নতুন নাম হল হো চি মিন নগর। এই ঐতিহাসিক বিজয়োৎসবের মধ্যেই পরের দিন অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের ১লা মে তারিখে পালিত হয়েছিল মুক্ত ভিয়েৎনামেব প্রথম মে দিবস!

—::—

ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ও মে দিবস

শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বজয়ী অভিযানে দেশে দেশে যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে ভারতের অবদানও অনস্বীকার্য। বিশেষ ক'রে বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর কীর্তি আজো সারা ভারতের গর্বের বিষয়।

ভারতে শিল্প-শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘট হয় ১৮৬২ সালের মে মাসে —দিনে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে। হাওড়া স্টেশনে ১২০০ রেল শ্রমিক করেছিলেন এই ধর্মঘট। সে যুগের দু'একটা বাংলা সংবাদপত্রও এই ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন আর শ্রমিকদের দাবি মেনে নেবার জন্যে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন অনুরোধ। দাবি মেনে না নিলে রেলে কাজ কবার লোক পাওয়া যাবে না বলে সাবধান-বাণীও উচ্চারিত হয়েছিল সংবাদপত্রে। *

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ঘটনাটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকায় মে দিবসের ধর্মঘট হয়েছিল ১৮৮৬ সালে আর আট ঘণ্টা আন্দোলনের প্রথম প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল ১৮৬৬ সালে। তারও আগে সেই ১৮৬২ সালে হাওড়ার রেল শ্রমিকেরা এই বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, আট ঘণ্টার দাবিতে প্রথম ধর্মঘট হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৫৬ সালের ২১শে

---

* রেল-শ্রমিকের অভ্যুদয়কে স্বাগত জানিয়ে এই ধর্মঘটের বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল সে যুগের বলিষ্ঠ প্রগতিশীল বাংলা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ'-এ (২৩ শে বৈশাখ, ১২৬৯)। শুধু তাই নয়। পরবর্তীকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে অডিট ডিপার্টমেণ্টে কেরাণী ধর্মঘট (১৮৬২), বোম্বাইয়ের ক্ষৌরকর্মীদের ধর্মঘট ও কলকাতার পাল্কি বাহকদের ধর্মঘট (১৮৬৩), কলকাতার ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান ধর্মঘট, বোম্বাইয়ের ছাপাখানার ধর্মঘট ও মাদ্রাজের মাংস-বিক্রেতা ধর্মঘট (১৮৭৩) ইত্যাদির সংবাদও প্রকাশিত হয় 'সোমপ্রকাশ'-এ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই পত্রিকার সাথে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম জড়িত। পত্রিকাটির আদি-পরিকল্পনাও বিদ্যাসাগরের।

এপ্রিল তারিখে একদিনের জন্য।* সেদিক থেকে হাওড়ার রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটটি সারা বিশ্বে দ্বিতীয় ধর্মঘট এবং তা চলেছিল কয়েকদিন ধরে। শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক ঘটনা হিসেবে অবশ্যই তা স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

ঘটনাটির মাত্র আট বছর আগে অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে বাংলায় প্রথম রেলপথ খোলা হয়। রেল শ্রমিকদের জন্মের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এই ঐতিহাসিক ধর্মঘট!

বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর এই ঘটনাটি কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। এটা যে শ্রমিকশ্রেণীর সুস্থ সহজাত প্রবৃত্তিরই বলিষ্ঠ প্রকাশ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তা ছাড়া, ঐতিহাসিক পটভূমিও আছে।

বাংলাতেই ভারতের প্রথম যন্ত্র শিল্পের উদ্বোধন হয় ১৮১৮ সালে। বৃটিশ পুঁজির উদ্যোগেই এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতের প্রথম সুতাকল—ফোর্ট গ্লষ্টার মিল। বর্তমানে সেটা বাউড়িয়া কটন মিল নামে পরিচিত।

ভারতের প্রথম চটকলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলায় ১৮৫৪ সালে।

স্মরণ রাখা উচিত, কলকাতা ও বোম্বাই—এ দু'টি শহরকে কেন্দ্র ক'রেই ভারতে পুঁজিবাদের জন্ম। কলকাতা ছিল বৃটিশ পুঁজির ঘাঁটি আর পরবর্তীকালে বোম্বাই হয়ে উঠল ভারতীয় পুঁজির কেন্দ্রস্থল।

কিন্তু কলকাতার দরজা দিয়ে শুধু সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিই ভারতে প্রবেশ করেনি, সাম্রাজ্যবাদী দেশের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অনুপ্রবেশও ঘটেছিল। সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সাথেই যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল কলকাতার। সেজন্যই সাহিত্যে, শিল্পে, সমাজ-সংস্কারে, ধর্ম-সংস্কারে, দর্শনে, সংগীতে, রাজনীতিতে ও সংস্কৃতির অজস্র বিভাগে বাংলার কৃতী সন্তানেরা সারা ভারতে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন ক'রে আসতে পেরেছে। রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অজস্র মনীষীর আবির্ভাব সেই সত্যই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শুধু তাই নয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় সাধারণ খেটে-খাওয়া

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

মানুষের সংগ্রাম, বিদ্রোহ ও সমাজবিপ্লবের কাহিনীও সেই যুগের ছাত্র সমাজ ও শিক্ষিত যুবকদের মনে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল এই কলকাতা শহরে। দু'একটা উদাহরণই হয়তো যথেষ্ট হবে। ১৮৩০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি হিন্দু কলেজের কোনো এক ছাত্র ইতিহাসের নজির তুলে সে যুগের ঔপনিবেশিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৮৩০ সালের ১০ই ডিসেম্বর টাউন হলে ২০০ লোকের উপস্থিতিতে ফরাসী জুলাই বিপ্লব পালিত হয়। সেই বছরের খৃস্টমাস দিবসে কয়েকজন 'অজ্ঞাতনামা' লোক মনুমেণ্টে ফরাসী-বিপ্লবের ঝাণ্ডা তোলেন।

এমনি নাম-না-জানা বিদ্রোহী মননশীল যুবকের অভাব হয়নি এই কলকাতা শহরে। এ কথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে, ১৮৭১ সালে (অর্থাৎ প্যারি কমিউনের বছরে) কোনো এক ব্যক্তি কলকাতায় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের একটি শাখা খোলার অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন এবং মার্কসের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সভায় তা আলোচিত হয়েছিল। এমন কি, চিঠিখানা আংশিকভাবে লণ্ডনের সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল।[৩২]

এইভাবে একদিকে শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম ও বিকাশ, আর অন্যদিকে শোষণ-মুক্তির উন্নত চেতনার বলিষ্ঠ প্রয়াস—এই দুটির মিলনই বাংলার শ্রমিক আন্দোলনকে ক্রমশ অনন্য ক'রে তুলেছে, সারা ভারতের কাছে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকায় উন্নীত করেছে।

কিন্তু শিল্প-বিকাশের সাথে সাথে সারা ভারতেই শ্রমিক আন্দোলন লাভ করেছে ব্যাপ্তি ও তীব্রতা। বোম্বাই, কানপুর, মাদ্রাজ ইত্যাদি শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলন সৃষ্টি করেছে ভারতের নিজস্ব ইতিহাস।

১৯০৮ সালে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতা বাল গঙ্গাধর তিলককে গ্রেপ্তার করল, তখন প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন সারা বোম্বাই শহরের সূতাকল শ্রমিকেরা। শুরু হল সর্বাত্মক ধর্মঘট আর প্রায় পাঁচ দিন ধরে বোম্বাইয়ের প্রকাশ্য রাজপথে

পুলিস ও মিলিটারির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁরা চালিয়েছিলেন এক বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র লড়াই। সেই সংগ্রামে শহীদ হয়েছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর বীর সন্তান গণপদ গোবিন্দ। এটাই ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক অভ্যুত্থান।

সুদূর রাশিয়ায় বসে লেনিনের চোখে ধরা পড়ল এই অভ্যুত্থানের ঘটনা ও তাৎপর্য ঃ

> "কিন্তু ভারতে নিজেদের লেখক ও রাজনৈতিক নেতাদের রক্ষার উদ্দেশ্যে রুখে দাঁড়ানোর জন্য জনতা পথে নামতে শুরু করেছে। ভারতীয় গণতন্ত্রী তিলকের উপর বৃটিশ খেঁকশিয়ালেরা যে কুখ্যাত দণ্ডাদেশ জারি করেছে—তাঁকে দীর্ঘ মেয়াদী নির্বাসন দেওয়া হয়েছে, বৃটিশ কমন্স সভার প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ যে, ভারতীয় জুরিরা তাঁকে বেকসুর খালাস দেন আর রায় দেওয়া হয় বৃটিশ জুরিদের ভোটে!—একজন গণতন্ত্রীর বিরুদ্ধে টাকার থলের সেবাদাসদের এই প্রতিহিংসার ফলেই উদ্ভূত হয়েছে বোম্বাইতে মিছিল ও ধর্মঘট। ভারতেও সর্বহারারা ইতিমধ্যেই সচেতন রাজনৈতিক গণ-সংগ্রামের স্তরে উন্নীত হয়েছে।"[৩৩]

পরবর্তীকালে শ্রমিক সংগঠনের সংখ্যা ও আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে। সেই অজস্র শ্রমিক সংগঠনের মিলিত প্রচেষ্টাতেই ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন—সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস।

আন্তর্জাতিক মে দিবসের অনুষ্ঠান তখনো পর্যন্ত ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে নি। আন্তর্জাতিকতার দীক্ষা এসেছে সচেতন প্রয়াসের ফলেই।

ভারতে প্রথম মে দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৩ সালের ১লা মে তারিখে মাদ্রাজের সমুদ্র-সৈকতে শ্রমিক নেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার-এর সভাপতিত্বে। সেই সভা থেকে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর এই পবিত্র দিনটিকে সরকারী ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

কমরেড চেট্টিয়ার ১৯২৪ সালের কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। জেলে থাকার সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর মুখেই শুনেছিলেন সেই ১৯২৩ সালের ঘটনা। কমরেড চেট্টিয়ারের বাড়িতে রক্ত পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। হাতের কাছে লাল ঝাণ্ডা না থাকায় কমরেড চেট্টিয়ার নিজ কন্যার শাড়ি ছিঁড়ে তা দিয়ে পতাকা তৈরি করেছিলেন।

ভারতের বাইরেও ভারতীয় শ্রমিকদের মে দিবস অনুষ্ঠানে যোগদানের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। ১৯২৫ সালের ৩রা মে তারিখের স্টেটসম্যানে লণ্ডন থেকে এক বিশেষ তারবার্তায় প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, ১লা মে তারিখে মে দিবস উপলক্ষে দশ হাজার স্ত্রী-পুরুষ-শিশু মিছিল ক'রে হাইড পার্কে জড়ো হয়েছিলেন। সেখানে 'ভারতকে মুক্ত কর নতুবা আমাদের পর্যায়ে নেমে এস' (Liberate India or come down to our rank)—এই লিখিত পতাকা বহন ক'রে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন একদল এশিয়াবাসী।

১৯২৬ সালের ৪ঠা মে তারিখের স্টেটসম্যানে রয়টারের প্রেরিত এক সংবাদে জানা যায়, ঐ বছরের মে দিবস অনুষ্ঠানে ভারতীয় জাহাজী ইউনিয়নের তরফ থেকে একটি প্রতিনিধি দল হাইড পার্কের জমায়েতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

বোম্বাইতেও মে দিবস পালিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে। ঐ দিনের শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন মিউনিসিপ্যাল শ্রমিকেরা এবং শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন এন. এম. যোশী, মীরাজকর, এস্. ভি. ঘাটে প্রমুখ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

১৯২৬ সালে লাহোরে বিভিন্ন পোস্টারে সজ্জিত হয়ে ধর্মঘটী টাঙ্গাওয়ালা শ্রমিকেরা মে দিবস পালন করেছিলেন ও লাল ঝাণ্ডা উড়িয়েছিলেন। সেখানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মীর আবদুল মজিদ। তিনি ভারতে প্রথম 'কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা'য় (অর্থাৎ পেশোয়ার

ষড়যন্ত্র মামলা) দণ্ডিত হন এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সাত বছর কঠোর সাজা ভোগ করেন।

ভারতে মে দিবস অনুষ্ঠানে ১৯২৭ সালটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ বছরেই প্রথম সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে মে দিবস পালনের জন্য সমস্ত প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই নির্দেশে সাড়া দিয়ে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি প্রধান প্রধান শহরে বিপুল উৎসাহের মধ্যে মে দিবস পালিত হয়।

গড়বড়ে নামক এক মারাঠী যুবকের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল খিদিরপুরের ক্রেন শ্রমিকদের একটি ইউনিয়ন। কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদও ছিলেন এই ইউনিয়নের একজন অন্যতম কর্মকর্তা। ১৯২৭ সালে সেই ধর্মঘটী ক্রেন শ্রমিকেরা বর্তমান রঞ্জি স্টেডিয়ামের ময়দানে মে দিবস পালন করেছিলেন।

কলকাতার সেই প্রথম মে দিবস কিন্তু বিনা বাধায় হয়নি। কলকাতায় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কার অজুহাতে ইংরেজ সরকারের পুলিস ১লা মে তারিখের সমাবেশ ও সভা-সমিতির উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি ক'রে অনুষ্ঠানটি পণ্ড করার চেষ্টায় ছিল। তারপর শ্রমিক নেতাদের কাছ থেকে শান্তিরক্ষার ও রাত ৮ টার মধ্যে সভার কাজ শেষ করার শর্তে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

কলকাতার মে দিবস শুধু সংগ্রামেই নয়, সংস্কৃতিতেও রেখে গেছে তার পদধ্বনি। বাংলার সংস্কৃতিতে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবদান এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯২৭ সালে 'গণবাণী'র মে দিবস সংখ্যায় শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগীতকে বাংলায় তর্জমা করে প্রকাশ করলেন কবি নজরুল 'অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত' নামে :

জাগো—

জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত !
যত অত্যাচারে আজ বজ্র হানি'
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী
নব জনম লভি' অভিনব ধরণী
ওরে ঐ আগত ॥

আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র-আচার
মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙ্গিব এবার !
ভেদি' দৈত্য-কারা
আয় সর্বহারা !
কেহ রহিবে না আর পর-পদ-আনত ॥

কোরাস ঃ

নব ভিত্তি 'পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে !
শোন্ অত্যাচারী ! শোন্ রে সঞ্চয়ী !
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী !
এই সংগ্রাম-মাঝ,
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ,
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ !
এই 'অন্তর-ন্যাশন্যাল-সংহতি' রে
হবে নিখিল মানব-জাতি সমুদ্ধত ॥*

---

* কবি নজরুলের নিজস্ব সুর ও আন্তর্জাতিকের মূল সুর—দুটো সুরেই গানটির স্বরলিপি লিখেছেন কাজী অনিরুদ্ধ। ডি. এম. লাইব্রেরী প্রকাশিত নজরুল-সুর-সঞ্চয়ন, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ৯০-৯৫ পৃষ্ঠায় দুটো স্বরলিপিই পাওয়া যাবে।

কেবল বাংলা তর্জমা ক'রেই তিনি ক্ষান্ত হননি, নিজেই সুর দিয়েছিলেন এই গানে। শ্রমিক আন্দোলনে, সভা-সমাবেশে, মিছিলে বহু বছর ধরে শ্রমিকদের মুখে মুখে এই গান প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে।

শুধু তাই নয়। 'গণবাণী'র ঐ একই সংখ্যায় কবি নজরুল লিখলেন আরেকটি গান, 'রক্ত-পতাকার গান' ঃ

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান !
তুলাও মোদের রক্ত পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান !
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥

শীতের শ্বাসেরে বিদ্রূপ করি ফুটে কুসুম,
নব-বসন্ত সূর্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ঐ দশ সহস্র বছরের হান মৃত্যুবান
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥

চির বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন,
নহে পুরাতন দাসত্বের ঐ বদ্ধ মন,
ওড়াও তবে রে লাল নিশান
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান।
বসন্তের ঐ জ্যোতির পতাকা ওড়াই উর্ধ্বে
গাহ রে গান
লাল নিশান! লাল নিশান!

এইভাবে সংগ্রামের সাথে সংস্কৃতির মিলনে বাংলার শ্রমিক আন্দোলন পেল এক নতুন বৈশিষ্ট্য, এক নতুন গতিপথ।

সে বছর বোম্বাইতেও মে দিবস পালিত হয়েছিল বিরাট উৎসাহের সাথে। লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে মিছিল ক'রে শ্রমিকেরা সভায়

যোগ দেন। মিছিল থেকেই আওয়াজ উঠেছিল 'আট ঘণ্টার বেশি খাটুনি নয়, বেতন সমেত ছুটি দিতে হবে' ইত্যাদি। ডেসিল রোডের এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ডি. আর. থেঙ্গেডী। বক্তা ছিলেন এন. এম. যোশী, ফিলিপ স্প্রাট ইত্যাদি।

১৯২৮ সাল থেকে একদিকে যেমন শুরু হল উত্তাল শ্রমিক আন্দোলন, অন্যদিকে তেমনি শ্রমিক আন্দোলনের উপর এল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড আঘাত। বোম্বাইয়ে বস্ত্র শিল্পে ছ'মাসের ধর্মঘট ও চটকল ধর্মঘট ঐ বছরের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। বোম্বাইতে সে বছর মে দিবস উপলক্ষে ছুটি সভা হয়েছিল, কিন্তু মিছিলের উপর পুলিশ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।

কলকাতায় মে দিবসের সমাবেশটি হয়েছিল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। যদিও কলকাতার পুলিস কমিশনার মিছিল ও নেতৃবৃন্দের উপর এক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, তা সত্ত্বেও শ্রদ্ধানন্দ পার্ক থেকে এক বিরাট মিছিল 'ছুনিয়ার মজুর এক হও' ধ্বনি দিতে দিতে রাজপথে বেরিয়ে পড়ে।

১৯২৯ সালে ঘটল আরেকটি ঘটনা। ২০শে মার্চ তারিখে সারা ভারতের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে দীর্ঘ দিনের জন্য জেলে পুরে রাখা হল। কিন্তু তাতে শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ারকে স্তব্ধ করা যায়নি।

১৯৩০ সাল। ১৮ই এপ্রিল রাতে বাংলার একদল বিপ্লবী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করলেন। ১৯ শে এপ্রিল ভোর থেকে শুরু হল সারা বাংলা জুড়ে ব্যাপক ধরপাকড় আর বহু শ্রমিক নেতাকেও আটক রাখা হল বিনা বিচারে। ৩০ শে এপ্রিল কলকাতার রাজপথে ধর্মঘটী গাড়ি-চালকেরা ব্যারিকেড তৈরি করে লড়াই চালালেন পুলিসের বন্দুকের মুখোমুখি। পরের দিন ১লা মে। সাম্রাজ্যবাদী সরকার তখন আতঙ্কগ্রস্ত। মে দিবস অনুষ্ঠানকে পণ্ড করার জন্য তারা গ্রেপ্তার ক'রে রাখল বহু শ্রমিক নেতাকে। ডাক্তার ভূপেন্দ্র

নাথ দত্ত ঐ সময় গ্রেপ্তার হন। তখনকার পুলিস কমিশনার মিঃ কলসন ডাক্তার দত্তের কাছে প্রকাশ করেছিলেন, সরকার নাকি ১লা মে তারিখে এক বিরাট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কা করেছিল।

১৯৩২ সালে মে দিবস পালনের আহ্বান জানিয়ে কমরেড সরোজ মুখার্জির উদ্যোগে বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা কমিটির নামে যে ইশতেহারটি বেরিয়েছিল, তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে মেটিয়াবুরুজে শ্রমিকদের এক সভায় মে দিবস পালিত হয়।

১৯৩৪ সালের মে দিবস আনুষ্ঠানটিও প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। কমরেড কমল সরকারের একটি স্মৃতি-চারণে সেই দিনগুলি অতি মনোরম ভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে ঃ

"১৯৩৪ সালের ঐ সভায় কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীর বক্তৃতার সময় কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির নামে ইস্তাহার বিলি হয়েছিল। যাঁরা বিলি করেছিলেন, পুলিস তাঁদের ধরতে পারেনি। সেই রাগে পুলিস হুলিয়া বার করল তখন ঐ সভায় যেহেতু কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সেই হেতু তাঁর বিরুদ্ধে। বঙ্কিমদা'র মা বারাণসীতে থাকতেন, তাই তিনি মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন। কলকাতা আদালতের সমন নিয়ে উত্তর প্রদেশের পুলিস কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে যেদিন কমরেড মুখার্জীকে হাজির করা হয় সেদিন আমিও অনুরূপ একটি মামলার আসামী হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। বঙ্কিমদাকে হাতে হাতকড়া কোমরে দড়ি পরিয়ে বারাণসী থেকে ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় করে সাধারণ দাগী আসামীর মতো ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল। কদিন ধরে না কামানোর ফলে একগাল দাড়ি মুখে বঙ্কিমদা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। ...এখানে একথা মনে রাখতে হবে যে ঐ সময়েই কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে বঙ্কিমদার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই উচ্চারিত হোত। তখনকার শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধাদের মধ্যে

যাঁদের নাম করা হোত তার মধ্যেও তাঁর নাম প্রথম সারিতেই পড়ত। তবু ব্রিটিশ সরকারের পুলিসী নির্যাতন থেকে তিনি রেহাই তো পানই নি বরং নিগ্রহের কেন্দ্র হয়েছিলেন।

এই মামলা চলার সময় একটি দিনের ঘটনা বললেই এই নিগ্রহ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মামলা চলার সময় বঙ্কিমদা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেওয়া সত্ত্বেও উকিলের আবেদন অগ্রাহ্য করে এম্বুলেন্সে তাঁকে বাগবাজারের বাড়ী থেকে কোর্টে হাজির করা হয়।

...তখনকার বি-পি-টি-ইউ-সি'র সেক্রেটারী ছিলেন এ-এম-এ জামান। জামান সাহেবের ডিগবাজীর কথা সবাই জানেন। সে যাই হোক, তাঁর নামে মে দিবসের এক ইস্তাহার ছাপা হয়। এই ইস্তাহারটা লেখা ও ছাপানোতে আমার হাত ছিল তা 'প্রমাণ' হয়। প্রেসের মালিকদের সাক্ষ্যে জনাব জামানের সঙ্গে প্রেস এ্যাক্টে আমারও ৩০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে একমাস জেলের সাজা হয়। জরিমানা আমি দিয়ে দিই।......

...১৯৩৪ সালে মেটিয়াবুরুজ, লিলুয়া, চন্দননগর ও কলকাতায় বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে মে-দিবস পালিত হওয়ায় পুলিস হকচকিয়ে যায়। এরপর পুলিসী সন্ত্রাস শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের উপর আরো নৃশংসভাবে নেমে আসে। এই ১৯৩৪ সালেই কলিকাতা ডকের ১৪ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। এরপর গ্রেপ্তার ও জেল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়। কমিউনিস্ট পার্টি ও বহু গণ-সংগঠন বে-আইনী হোল। কয়েক বছর পর কলিকাতা কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা পুলিস দায়ের করে।

১৯৩৪ সালে শুধু কলকাতায় নয়, ভারতের অন্যান্য স্থানেও খুব জোরালো মে দিবস পালিত হয়। দিল্লীতে ঐ দিন দিল্লী ক্লথমিলে ধর্মঘট হয়। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ ও আরো দু জায়গায় রক্ত পতাকা তোলা হয়। করাচীতে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেন। ঐ সময় বোম্বাই-এ লক্ষাধিক সুতাকল শ্রমিকের ধর্মঘট হয়েছিল।

"...১৯৩৭ সাল। আমরা তখন কংগ্রেসের সঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রন্ট করছি। বি-পি-সি-সি'র অন্যতম সহকারী সম্পাদক হয়েছিলাম। কিন্তু পুলিসের হাত থেকে তা বাঁচাতে পারল না। মে দিবসের একটি পোষ্টার ছাপার জন্যে তিন মাস জেল হোল। এই পোষ্টার ছিল ভারতীয় শ্রমিক ও জনসাধারণ নিষ্পেষিত হচ্ছে বুটের তলায়। আর সম্পদ বিদেশে চালান হয়ে যাচ্ছে। বুটের মালিকের হাতের বোতামে একটি ইউনিয়ন জ্যাক দেখা যাচ্ছে। ...এই পোষ্টারে বলা হয়েছিল: 'ধনী আরো ধনী হলো, গরীব হলো আরো গরীব।' হাইকোর্টের রায়ে বলা হোল এটা বে-আইনীও নয়, রাজদ্রোহও নয়।"[৩৪]

১৯৩৭ সাল থেকে জাতীয় কংগ্রেসের একটি অংশও মে দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুরু করে। বিশেষ ক'রে কলকাতা ও বোম্বাইতে এ-আই-টি-ইউ-সি ও জাতীয় কংগ্রেস প্রায়ই যুক্তভাবে মে দিবস পালন করেছে ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত।

১৯৪০ সালে মে দিবস পালিত হয়েছিল বি-পি-টি-ইউ-সি ও বি-পি-সি-সি'র যুক্ত উদ্যোগে। মনুমেণ্টের নিচে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বি-পি-টি-ইউ-সি'র সভাপতি মৃণাল কান্তি বসু আর উপস্থিত ছিলেন বি-পি-সি-সি'র সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। ভারত-রক্ষা আইনের নিন্দা ক'রে ও শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে সেই আইন প্রয়োগের তীব্র নিন্দা ক'রে সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয়। আরেকটি প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সংকল্পটি আবার নতুন ক'রে ঘোষণা করা হয়।

ঐ একই দিনে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে আরেকটি সমাবেশ হয়েছিল এবং প্রস্তাবে স্বাধীনতার জন্য দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়েছিল।

১৯৪৩ সালের ১লা মে নাগপুরে এ-আই-টি-ইউ-সি'র ২০ তম অধিবেশন ও মে দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছিল একই সাথে। অনুষ্ঠানে

সভাপতিত্ব করেন ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের জন্য সোভিয়েত দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও লাল ফৌজকে অভিনন্দন জানানো হয় ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে।

মধ্যপ্রদেশে অবশ্য ঐ বছর প্রকাশ্যে কোনো মে দিবস অনুষ্ঠান হয়নি কেননা সরকার সভাসমিতি নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছিল।

১৯৪৫ সালে কলকাতায় মে দিবসে আরো ব্যাপকতা লাভ করে—শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র, যুব ও অন্যান্য খেটে-খাওয়া মানুষের সে এক বিশাল সমাবেশ। এই অনুষ্ঠান থেকে সোভিয়েতের লাল ফৌজ ও চীনা জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে অভিনন্দন জানানো হয়। তা ছাড়া, বিশেষ উল্লেখযোগ্য, মে দিবসকে একটি সাধারণ ছুটির দিন হিসাবে ধার্য করার জন্য দাবি জানানো হয় সরকারের কাছে।

১৯৪৬ সালের মে দিবসটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। কলকাতার ময়দানে বি-পি-টি-ইউ-সি'র উদ্যোগে ও মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে এক বিশাল সমাবেশ হয়। বিখ্যাত বৃটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্ত তখন ভারত ভ্রমণ উপলক্ষে কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ সমাবেশে বক্তৃতা দেন। মেটিয়াবুরুজে আরেকটি শ্রমিকসভাতেও তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন ও সহযোগিতার কথা শোনালেন এবং ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি তাঁদের সৌভ্রাতৃত্ব ও অভিনন্দন জানালেন তিনি। আন্তর্জাতিকতা বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল সমগ্র সমাবেশ।

গণ-আন্দোলনের সঞ্জীবনী ধারায় যুগে যুগে পুষ্ট হয়েছে বাংলার সংস্কৃতি-সাহিত্য-কাব্য। এই যুগেও দেখা গেল বাংলা কবিতার নব জাগরণ। বাংলা কবিতায় প্রাণের জোয়ার নিয়ে এল কিশোর বিদ্রোহী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। খেটে-খাওয়া মানুষের আশা-বেদনা-অনুভূতি নিয়ে তাঁদের সংগ্রামের একান্ত সাথী হয়ে দাঁড়াল এই কবি। তার কবিতা আজো আমাদের সংগ্রামী প্রেরণা'র বলিষ্ঠ উৎস। ১৯৪৬

সালের উদ্বেল ১লা মে তারিখে সুকান্তের "পয়লা মে'র কবিতা, ১৯৪৬" আহ্বান জানাল শোষিত মানুষের কাছে :

"লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে,
কী হবে আর কুকুরের মতো বেঁচে থাকায় ?
কতো দিন তুষ্ট থাকবে আর
অপরের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাড়ে ?
মনের কথা ব্যক্ত ক'রবে
ক্ষীণ অস্পষ্ট 'কেঁউ' 'কেঁউ' শব্দে ?
ক্ষুধিত পেটে ধুঁকে ধুঁকে চ'লবে কতোদিন ?
ঝুলে পড়া তোমার জিভ,
শ্বাসে প্রশ্বাসে ক্লান্তি টেনে কাঁপতে থাকবে কতোকাল ?
মাথায় মৃদু চাপড় আর পিঠেহাতের স্পর্শে
কতক্ষণ ভুলে থাকবে পেটের ক্ষুধা আর গলার শিকলকে ?
কতক্ষণ নাড়তে থাকবে লেজ ?

তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে।।"

১৯৪৭ সালে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর তারই ফলে জন্ম দেয় দুটি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। বাংলাদেশও দ্বিখণ্ডিত

হল—পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তান নামে। তারপর শুরু হল শোষণের নগ্ন ইতিহাস। শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের সংকল্পে শ্রমিকশ্রেণী এখনো অটল, সেই সংগ্রাম এখনো অব্যাহত।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের বিশ বছর পরে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল এই পশ্চিম বাংলায়। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল যুক্তফ্রণ্ট সরকার এবং সেই বছরেই মে দিবসে পশ্চিম বাংলার সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ও শিল্পে এই প্রথম সরকারীভাবে ছুটি ঘোষিত হল। শ্রমিকশ্রেণীর বহুদিনের একটা দাবি পশ্চিম বাংলার মাটিতে আদায় করা হল। এ ব্যাপারেও পশ্চিম বাংলার শ্রমিক আন্দোলন সারা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৭২ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভাব। এটাও লক্ষণীয়, ঐ বছর খেটে-খাওয়া সংগ্রামী মানুষের উদ্যোগে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে পালিত হয়েছে মে দিবস।

১৯৭৪ সালের সারা ভারত রেল শ্রমিকদের দীর্ঘতম ও বৃহত্তম ধর্মঘট হল আরেকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। রেল শ্রমিকদের দাবিগুলির মধ্যে আট ঘণ্টা কাজের দাবিটি ছিল অন্যতম। ১৮৬২ সালের মে মাসে হাওড়া স্টেশনে আট ঘণ্টার দাবিতে রেল শ্রমিকদের যে ধর্মঘট হয়েছিল, তা ভারতের শিল্প শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘট! সেই রেল শ্রমিকেরা আবারো ১৯৭৪ সালের ভারতব্যাপী রেল ধর্মঘট মারফৎ সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দিল, আট ঘণ্টার কাজ এখনো অর্জিত হয়নি এদেশে। এই ধর্মঘটের সময় সমাজতন্ত্রের নামাবলী পরিহিত ভারত সরকারের শুধু শ্রমিক-বিরোধী পুঁজিবাদী চরিত্রই প্রকট হয়ে ওঠে নি, তারা যে কতো নির্মম, নিষ্ঠুর, হিংস্র হতে পারে, তার প্রমাণও রেখেছে। পুঁজিবাদী দাসত্বের অবসান, শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া

শ্রমিকশ্রেণী ও মানব সমাজের মুক্তি নেই—এই চেতনা ও প্রত্যয় ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে আজ আরো গভীর ও ব্যাপক হয়েছে।

সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম আজ আর বিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ প্রয়াস নয়, সারা দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত। শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বজয়ী অভিযানের অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য পরিণতিই হল সমাজতন্ত্র সেই অভিযান যতই যন্ত্রণাদায়ক, যতই বিপদসংকুল, যতই দীর্ঘস্থায়ী হোক না কেন, তার গতিবেগ প্রতিদিনই উত্তাল হয়ে উঠছে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আর শোষক-শাসকের মনে আনছে অসীম আতংক। এই দুনিয়া-জোড়া অভিযানে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অগণিত খেটে-খাওয়া মানুষেরাও যে যোগ্য ভূমিকা নেবে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

—::—

পরিশিষ্ট—ক

মে দিবসের জন্মকথা

রোজা লুকসেমবুর্গ

আট ঘণ্টা কাজের দিন অর্জনের উপায় হিসেবে সর্বহারার একটা ছুটির দিন চালু করার প্রেরণাদায়ক ভাবনার প্রথম উদয় হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়। সেই ১৮৫৬ সালে সেখানকার শ্রমিকেরা একদিন পূর্ণ কর্মবিরতির আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—আট ঘণ্টা দিনের বিক্ষোভ-সমাবেশ হিসেবে দিনটি কাটবে সভাসমিতি ও আনন্দোৎসবের মধ্যে দিয়ে। ২১শে এপ্রিল তারিখটিই চিহ্নিত হয়েছিল এই ছুটির দিন হিসেবে। শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকেরা ১৮৫৬ সালে একবারই এরকম ছুটির দিন পালনের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু এই প্রথম অনুষ্ঠানটিই অস্ট্রেলিয়ার সর্বহারা জনগণের মনে এমন গভীর ছাপ ফেলেছিল যে এই ছুটির দিনটিকে প্রতিবছর পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বস্তুত, নিজেদের খুশিমতো গণ-কর্মবিরতির চেয়ে শ্রমজীবী মানুষকে আরো বেশী সাহস ও নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাস আর কিসে দিতে পারত? নিজেদের শক্তিকে সংহত করা ছাড়া কারখানা ও কর্মশালার চিরন্তন দাসদের আরো সাহস আর কিসে দিতে পারে? সুতরাং, সর্বহারার ছুটিব দিনের ধারণাটি অতি দ্রুত স্বীকৃতি পেল এবং তা অস্ট্রেলিয়া থেকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল দেশে-দেশান্তরে, অবশেষে জয় করল সারা শ্রমজীবী দুনিয়াকে।

অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকদের দৃষ্টান্তটি আমেরিকানরাই প্রথম অনুসরণ করেন। তাঁরা ১৮৮৬ সালের পয়লা মে তারিখটিকে সাধারণ কর্মবিরতির দিন হিসেবে স্থির করলেন। ঐ দিন দু'লাখ শ্রমিক কাজ থেকে বিরত থাকেন ও আট ঘণ্টার দিন দাবি করেন। পরে সরকারী অত্যাচারের ফলে কয়েক বছরের জন্য এই বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ রাখতে শ্রমিকেরা বাধ্য হন। যাই হোক, ১৮৮৮ সালে তাঁরা আবার নতুন করে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ১৮৯০ সালের পয়লা মে তারিখটিকে পরবর্তী ছুটির দিন হিসেবে স্থির করলেন।

ইতিমধ্যে ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলন বিরাটভাবে বিকাশ লাভ করেছে এবং নতুন প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়েছে। ১৮৮৯ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে ঘটল এই অভ্যুত্থানেরই চরম অভিব্যক্তি। এই সম্মেলনে সমবেত ৪০০ জন প্রতিনিধি সর্বপ্রথম সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নিলেন আট ঘণ্টা দিনের জন্য। বোরডু থেকে আগত ফরাসী ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি শ্রমিক লেভিনে সকল দেশের শ্রমিকদের একটি সর্বজনীন ছুটির দিনের এই দাবিটিকে রূপ দেবার জন্য একটি প্রস্তাব আনেন। আমেরিকান শ্রমিকদের প্রতিনিধি ১৮৯০ সালের পয়লা মে সম্পর্কে তাঁর কমরেডদের সিদ্ধান্তের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সম্মেলন এই তারিখটিকেই আন্তর্জাতিক ছুটির দিন হিসেবে চিহ্নিত করে।

প্রকৃতপক্ষে, তিরিশ বছর আগের অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকদের মতো এক্ষেত্রেও একবারের জন্যই বিক্ষোভের কথা ভাবা হয়েছিল। সম্মেলন সিদ্ধান্ত নেয় যে আট ঘণ্টা দিনের দাবিতে ১৮৯০ সালের পয়লা মে তারিখে সকল দেশের শ্রমিকেরা একত্রে বিক্ষোভ-সমাবেশ করবে। পরবর্তী বছরগুলিতে ছুটির দিনটির পুনরাবৃত্তির কথা কেউ বলেন নি। অবশ্য কত সুষ্ঠুভাবে এই প্রস্তাবটি সফল হবে এবং কত দ্রুত শ্রমিক শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, তাও কেউ ভাবতে পারেন নি। প্রত্যেকে যেন মুহূর্তে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারেন যে মে দিবস অনুষ্ঠানটি একটি স্থায়ী বার্ষিক ঘটনা হওয়া উচিত, তার জন্য ১৮৯০ সালে একবার মে দিবস পালন করাই যথেষ্ট।

আট ঘণ্টা দিনের আওয়াজ তুলেছে পয়লা মে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধিত হলেও মে দিবস পালন উঠে যাবে না। যতদিন পর্যন্ত বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম চলবে, যতদিন না সমস্ত দাবি মিটছে, মে দিবসের ছুটি উদ্‌যাপন হবে সেই সব দাবিরই বার্ষিক অভিব্যক্তি। কিন্তু সুদিনের সুপ্রভাত এলেও এবং সারা দুনিয়ায় শ্রমিক শ্রেণী মুক্তি অর্জন করলেও, হয়তো তখনো অতীতের সংগ্রাম ও যন্ত্রণার স্মৃতিতে মানবসমাজ পালন করবে পয়লা মে। ৩৫

লাল পতাকার কথা

একটা ভুল ধারণা কোনো কোনো শ্রমিক নেতা ও কর্মী প্রায়ই তাঁদের লেখায় ও বক্তৃতায় প্রচার ক'রে থাকেন—লাল পতাকা নাকি আমেরিকার ঐতিহাসিক মে দিবসেই সৃষ্টি হয়েছিল। ধারণাটা মোটেই সঠিক নয়। লাল পতাকার জন্ম ও বিকাশ নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা না করলেও সংক্ষেপে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বোধ করছি।

১৮৩২ সালের জুন অভ্যুত্থানের সময় প্যারিসের শ্রমিক বসতির চারপাশে তৈরী ব্যারিকেডের উপরই প্রথম উত্তোলন করা হয়েছিল একটি লাল পতাকা, বিপ্লবী সংগ্রামের পতাকা।[৩৬] ১৮৪৮ সালের জুন অভ্যুত্থানেও ফরাসী শ্রমিকেরা আবার লাল পতাকা তোলেন। মার্কসের লেখায় তার উল্লেখ আছে।[৩৭] ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউনেও লাল পতাকা তোলা হয়েছিল।[৩৮] সুতরাং, ১৮৮৬ সালের ঐতিহাসিক মে দিবসকে লাল পতাকার জন্মদাতা বলা সঠিক নয়।

বলা বাহুল্য, এই লাল পতাকার নিচে সমবেত হয়ে সারা দুনিয়ার খেটে-খাওয়া মানুষেরা বিরাট বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। তাই সামাজিক ন্যায় ও শোষণহীন সমাজের জন্য সংগ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই পতাকা।

শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে পতাকার সৃষ্টি, তাকেই গ্রহণ করেছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন আর শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর প্রতীক হিসেবেই যুক্ত হয়েছে কাস্তে ও হাতুড়ি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কংগ্রেসী মহলে অনেকের মনেই এই পতাকার প্রতি অবজ্ঞা বা বিদ্বেষের মনোভাব ছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকেও একাধিকবার এ ব্যাপারে মুখ খুলতে হয়েছে। ১৯৩৭ সালে সনৎ কুমার রাহার এক পত্রের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু যে চিঠিখানা লিখেছিলেন, তার বাংলা অনুবাদ সম্প্রতি একটি

পত্রিকায় দেখলাম। পুরো চিঠিখানাই নিচে দেওয়া হল :

"অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি

স্বরাজ ভবন, এলাহাবাদ

এস এস একমা

মে ৫, ১৯৩৭

শ্রীসনৎ কুমার রাহা

পোঃ খাগড়া, বহরমপুর

প্রিয় কমরেড,

আপনার ২৫শে এপ্রিলের পত্রে আপনি আমাকে লাল পতাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশ কমিটির নিকট সার্কুলার পাঠিয়েছি, কাগজে তা প্রকাশ পেয়েছে। লাল পতাকা বিশ্বব্যাপী কৃষক ও মজুরের একশো বছরের পুরাতন পতাকা। সেইজন্য এই পতাকা আমাদের কাছেও সম্মানীয়। কিন্তু কংগ্রেস ও কংগ্রেস কর্মীদের কাছে ভারতের জাতীয় পতাকা স্বীকৃত এবং এই পতাকা সর্বদাই প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হওয়া উচিত।

ভারতের মূল প্রশ্ন হচ্ছে কৃষক ও শ্রমিকের অভিযোগ ও বিক্ষোভ। এই প্রশ্ন দিন দিন আরও মুখ্য হয়ে উঠতে বাধ্য। কংগ্রেসের উচিত এই সমস্যাকে নিজের মনে করে সমাধান করা। ভারতের যে অংশে কংগ্রেস কৃষক প্রশ্নের সঙ্গে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল সেই অংশে পাল্টা আন্দোলনের বিষয়ে যা আপনি উল্লেখ করেছেন তা পৃথক রূপ নেয়নি এবং যেখানেই তাকে তেমনভাবে কংগ্রেস রূপ দিতে পারেনি সেখানেই কৃষকের বিক্ষোভ প্রকাশের অনুকূল রাস্তা না থাকায় পাল্টা আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

আপনাদের

জওহরলাল নেহরু।"[৩৯]

লাল পতাকা যে "বিশ্বব্যাপী কৃষক ও মজুরের একশো বছরের পুরাতন" ও "সম্মানীয়" আন্তর্জাতিক পতাকা, সেই ঐতিহাসিক সত্যই পণ্ডিত নেহরুর চিঠিতে স্থান পেয়েছে। লাল পতাকা সৃষ্টির দেড়শো বছর পর আজো তা শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বজয়ী বিজয়াভিযানে এক দুর্জয় প্রতীক।

গ্রন্থ-নির্দেশিকা

১· Minutes of the General Council of the First International 1868—1870, Progress Publishers, Moscow, Page 418. (পৃ: ৩৩)

২ Ibid, Page 421 (পৃ: ৩৩)

৩ Ibid, Page 451 (পৃ: ৩৩)

৪ Ibid, Page 325 (পৃ: ৩৪)

৫ Ibid, Page 341—342 (পৃ: ৩৫)

৬ A History of the Amerieau Labour Movement —Richard O. Boyer & Herbert M. Morais, John Calder, London, page 100 (পৃ: ৫৭)

৭ Dynamite—The Story of Class Violence in America—Louis Adamic, Chelsea House Publishers, New York, London, 1934. (পৃ: ৫৮)

৮ Minutes of the General Council of the First International 1864—1866, Pages 283—284. (পৃ: ৬৭)

৯ Ibid, Pages 342—343. (পৃ: ৬৯)

১০ Marx-Engels Selected Correspondence, Progress Publishers, Moscow, 1965, Page 184. (পৃ: ৬৯)

১১ Ibid, Page 186 (পৃ: ৭০)

১২ Capital Vol. 1, Karl Marx, Moscow. Page 301 (পৃ: ৭০)

১৩ Ibid (পৃ: ৭১)

১৪ Minutes of the General Council of the First International 1868—70, Page 447 (পৃ: ৭১)

১৫ Selected Correspondence, Pages 393—394 (পৃ: ৭৩)

১৬ Ibid, Pages 398—399 (পৃ: ৭৪)

১৭ Long Live the First of May—J.V Stalin Works, Vol. 2 Moscow, 1953—Page 225 (পৃ: ৭৯)

১৮ History of May Day, Alexander Trachtenberg, PPH, Bombay, 1953—Pages 21—22 (পৃ: ৮০)

১৯ Ibid, Page 23. (পৃ: ৮১)

২০ May 4 in London—Frederick Engels, Articles on Britain by Marx and Engels, Progress Publishers, Moscow, (পৃ: ৮৩)

২১ The Rise and Fall of The Third Reich—William L. Shirer—Pan Books Ltd, London, (পৃ: ৮৫)

২২ Ibid, Pages 1342, 1348 (পৃ: ৮৫)

২৩ History of May Day—Alexander Trachtenberg, Page 17 (পৃ: ৮৬)

২৪ Preface to the pamphlet, May Days in Kharkov, Lenin, Collected Works, Vol. 4, (পৃ: ৮৬)

২৫ Ibid, Page 362 (পৃ: ৮৬)

২৬ The Russian Social Democratic Party and its immediate tasks—J.V. Stalin Works, Vol. 1, Moscow, 1952—Page 19 (পৃ: ৮৭)

২৭ Lenin, Collected Works, Vol. 6, Page 473 (পৃ: ৮৭)

২৮ Lenin, Collected Works, Vol. 7, Pages 199-200 (পৃ: ৮৮)

২৯ The First of May—Lenin, Collected Works, Vol. 8, Moscow, (পৃ: ৮৮)

৩০ May Day Action by the Revolutionary Proletariat—Lenin, Collected Works, Vol. 19, Moscow, 1963—Page 218. (পৃ: ৮৮)

৩১ May Day—J. V Stalin Works, Vol. 3, Moscow, 1953, Page 39 (পৃ: ৮৯)

৩২ Minutes of the General Council of the First International 1870-71, Pages 258, 530 (পৃ: ৯০)

৩৩ Inflamable material in world politics—Lenin, Collected Works. Vol. 15, Page 184. (পৃঃ ৯৪)
৩৪ অতীতের স্মৃতি বিজড়িত যে-দিবসের দিনগুলি—কমল সরকার, স্বাধীনতা, ১লা মে, ১৯৬২। (পৃঃ ১০২)
৩৫ International Socialist Review, (পৃঃ ১০৮)
৩৬ Marx-Engels Selected Works, Vol. 1. (পৃঃ ১০৯)
৩৭ Ibid, Page 214. (পৃঃ ১০৯)
৩৮ History of the Commune of 1871—Lissagaray, Editions Indian, (পৃঃ ১০৯)

৩৯ মূল্যায়ন, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৪, ১৩৮৮, পৃষ্ঠা ২৪

ঘটনাপঞ্জী

১৮১৮ বাংলায় ভারতের প্রথম সুতাকল স্থাপন ও যন্ত্র শিল্পের উদ্বোধন। (পৃঃ ৯২)

১৮২৭ পৃথিবীর প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন বলে খ্যাত ফিলাডেলফিয়ার মেকানিকদের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা। (পৃঃ ২০)

১৮৩০ কলকাতায় ফরাসী জুলাই বিপ্লব পালন। (পৃঃ ৯৩)

১৮৩৭ মার্কিন রাষ্ট্রপতি ভ্যান ব্যুরেনের আমলে সরকারী কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য দশ ঘণ্টা কাজের দিন চালু হয়। (পৃঃ ২০-২১)

১৮৫৪ বাংলায় রেলপথ প্রতিষ্ঠা ও ভারতের প্রথম চটকল স্থাপন। (পৃঃ ৯২)

১৮৫৬ ২১ শে এপ্রিল। আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে অস্ট্রেলিয়ায় শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘট। (পৃঃ ৯১)

১৮৬১-৬৫ আমেরিকার গৃহযুদ্ধ। (পৃঃ ২১, ২৮-২৯)

১৮৬২ মে মাসে হাওড়া স্টেশনে দিনে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে ১২০০ রেল শ্রমিকের ধর্মঘট—ভারতে শিল্প শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘট। (পৃঃ ৯১)

১৮৬৩ আমেরিকার প্রথম জাতীয় ইউনিয়নগুলির অন্যতম ন্যাশনাল মোলডার্স ইউনিয়নের পুনর্গঠন। (পৃঃ ৩০)

১৮৬৪ প্রথম আন্তর্জাতিক—'আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতি' (International Workingmen's Association) প্রতিষ্ঠা। (পৃঃ ৬৬)

১৮৬৬ আমেরিকার শ্রমিকদের প্রথম জাতীয় ফেডারেশন ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা। (পৃঃ ১৬, ৩০-৩১)

প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের দাবিকে আন্তর্জাতিক দাবিতে পরিণত করে। (পৃঃ ৬৮)

১৮৬৭ মার্কসের ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড প্রকাশ। (পৃঃ ৭০)

১৮৬৯ উইলিয়াম এইচ. সিলভিস-এর মৃত্যু ও আন্তর্জাতিকের শোক বার্তা। (পৃঃ ৭১)

নাইটস অব লেবার (Knights of Labor) নামে শ্রমিকদের আরেকটি জাতীয় ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা। (পৃঃ ৩৫)

১৮৭১ কলকাতায় প্রথম আন্তর্জাতিকের একটি শাখা খোলার চেষ্টা।
(পৃ: ৯৩)

১৮৭২ ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের শেষ সম্মেলন ও বিলোপ। (পৃ: ৩৫)

১৮৭৪ নিউ ইয়র্কে টমকিন স্কোয়ারের জনসভায় বেকারদের উপর পুলিশের নৃশংস আক্রমণ। (পৃ: ৪১)

১৮৭৭ আমেরিকার রেল ও ইস্পাত শ্রমিকদের বিখ্যাত ধর্মঘট। (পৃ: ১৬, ২২)

১৮৮১ ফেডারেশন অব অর্গানাইজড ট্রেডস অ্যাণ্ড লেবার ইউনিয়নস অব দি ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাণ্ড কানাডা (Federation of Organized Trades and Labor Unions of the United States and Canada) প্রতিষ্ঠা। (পৃ: ৪৩)

১৮৮২। পৃথিবীর প্রথম আধুনিক ট্রাস্ট—স্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানির প্রতিষ্ঠা।
(পৃ: ২৬)

১৮৮৩ আমেরিকায় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির (International Working Men's Association) শাখা প্রতিষ্ঠা। (পৃ: ৩৯)

১৮৮৪ আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়, ১৮৮৬ সালের ১লা মে তারিখে আট ঘণ্টার দিন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হবে। (পৃ: ৪৩)

১৮৮৫ জে গোল্ডের ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথে প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট।
(পৃ: ২৫)

১৮৮৬ দক্ষিণ পশ্চিম রেলপথে শ্রমিক ধর্মঘট। (পৃ: ২৫)

১৮৮১ সালে গঠিত ফেডারেশনের নতুন নাম হয় আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার (American Federation of Labor)। (পৃ:৪৩)

১লা মে। আট ঘণ্টার দাবিতে সারা আমেরিকায় শ্রমিক ধর্মঘট।
(পৃ: ৪৮)

৩রা মে। পুলিসের গুলিতে ছ'জন শ্রমিক নিহত। (পৃ: ৫০)

৪ঠা মে। হে মার্কেটে প্রতিবাদ সভা। বোমা বিস্ফোরণে পুলিস নিহত। পুলিস ও জনতায় খণ্ডযুদ্ধে সাতজন পুলিস ও চারজন শ্রমিক নিহত। (পৃ: ১৮, ৫০-৫২)

২১ শে জুন। বিচারক জোসেফ ই গ্যারির কাছে বিচারের প্রহসন শুরু।
(পৃ: ৫৪)

৯ই অক্টোবর। সাতজন শ্রমিক নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।
(পৃঃ ৫৯

১৮৮৭ ১১ই নভেম্বর। স্পাইজ, ফিশার, এঞ্জেল ও পার্সনস-এর ফাঁসি।
(পৃঃ ৫৯)

১৮৮৮ ডিসেম্বরে সেণ্ট লুই'র সম্মেলনে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার ১৮৯০ সালের ১লা মে থেকে প্রতি বছর মে দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। (পৃঃ ৭৪)

১৮৮৯ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা সভায় মে দিবসকে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। (পৃঃ ৭৪)

১৮৯০ কমিউনিস্ট ইশতেহারের জার্মান সংস্করণে মে দিবস প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের ভূমিকা। (পৃঃ ৭৫)
৪ঠা মে তারিখে লণ্ডনের হাইড পার্কে মে দিবসের সমাবেশ।
(পৃঃ ৮১-৮২)

১৮৯৩ আন্তর্জাতিকের জুরিখ কংগ্রেসের প্রস্তাব। (পৃঃ ৭৬)

১৮৯৬ লেনিনের মে দিবস ইশতেহার। (পৃঃ ৮৫)

১৯০০ 'খারকভে মে দিবস' নামক পুস্তিকায় লেনিনের ভূমিকা। (পৃঃ ৮৫)

১৯০৩ পার্টি কংগ্রেসে মে দিবস সম্পর্কে লেনিনের খসড়া প্রস্তাব। (পৃঃ ৮৭)

১৯০৪ লেনিনের 'মে দিবস' ইশতেহার। (পৃঃ ৮৭)

১৯০৫ লেনিনের '১লা মে' ইশতেহার। (পৃঃ ৮৮)

১৯০৮ বোম্বাইতে তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ধর্মঘট ও সশস্ত্র লড়াই। লেনিনের মন্তব্য। (পৃঃ ৯৩)

১৯১২ মে দিবস সম্পর্কে স্তালিনের ইশতেহার। (পৃঃ ৭৭)

১৯১৭ প্রাভদায় স্তালিনের লেখা 'মে দিবস'। (পৃঃ ৮৯)

১৯২০ সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম। (পৃঃ ৯৪)

১৯২৩ মাদ্রাজে ভারতের প্রথম মে দিবস পালন। (পৃঃ ৯৪)

১৯২৪ কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা। (পৃঃ ৯৫)
চীনে ডাঃ সান ইয়াত সেনের নেতৃত্বে প্রথম মে দিবস পালন। (পৃঃ ৮৩)

১৯২৫ লণ্ডনে ভারতীয়দের মে দিবস পালন। (পৃঃ ৯৫)

১৯২৬ লণ্ডনে ভারতীয় জাহাজী ইউনিয়ন থেকে মে দিবস সমাবেশে যোগদান। (পৃঃ ৯৫)

বোম্বাইতে প্রথম মে দিবস সমাবেশ। (পৃ: ১৫)

লাহোরে মে দিবস পালন। (পৃ: ৯৫)

১৯২৭ সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে বিভিন্ন প্রদেশে মে দিবস পালন। (পৃ: ৯৬)

কবি নজরুলের 'অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত' ও 'রক্ত-পতাকার গান' প্রকাশ। (পৃ: ৯৬-৯৮)

১৯২৮ মার্কিন রাষ্ট্রপতি হুভারের আমলে মে দিবসকে শিশু স্বাস্থ্য দিবস করার অপচেষ্টা। (পৃ: ৮০)

১৯২৯ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। (পৃ: ৯৯)

১৯৩০ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল। (পৃ: ৯৯)

১৯৩৩ হিটলারের মে দিবস সমাবেশ। পৃ: ৮৪)

১৯৪৫ মে দিবসে বিজয়ী সোভিয়েত লালফৌজের বার্লিনে প্রবেশ। (পৃ: ৮৫)

১৯৪৬ কলকাতা ময়দানে মে দিবস সমাবেশে রজনী পাম দত্তের যোগদান। (পৃ: ১০৩)

কবি সুকান্তের "পয়লা মে'র কবিতা, ১৯৪৬" প্রকাশ। (পৃ: ১০৪)